উনিশ শতকের মহিলা ঔপন্যাসিক

শার্লট ব্রন্টি-এমিলি ব্রন্টি

গ্রন্থায়তন

শার্লট ব্রন্টি-এমিলি ব্রন্টি

বৈশাখ, ১৩৬১

ত্রিদিব সরকার কর্তৃক
গ্রন্থায়তন, ৮৬।৩৮ বি, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা-১৩
হইতে প্রকাশিত
ও
এম্‌এস্‌ প্রেস, ৮৬।৩৮ বি, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা ১৩
হইতে মুদ্রিত।

গ্রন্থন:—মফিজুর রহমান এণ্ড কোং, ১৭বি, পাটোয়ার বাগান লেন, কলিকাতা-৯

সূচী

জীবনকাহিনী

সারা জীবনই বিষাদ-করুণ। এমন একটি জীবনের দেখা কমই মেলে ইংরেজি সাহিত্যে। বেঁটেখাটো, শীর্ণ চেহারা। রূপের ভাণ্ডারে ঘাটতি। কিন্তু অনুভূতি তীক্ষ্ণ এবং মন আবেগে ভরপুর। জীবন-যন্ত্রণায় দারুণ জ্বলেছেন। তবু হার মানতে রাজি হননি। জীবনভর মাথা খুঁড়েছেন অসম্ভবের পায়ে, খুঁজে বেড়িয়েছেন আনন্দ এবং সুখ। পেয়েছিলেন কি? হয়তো পেয়েছিলেন—একেবারে জীবনের শেষলগ্নে, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার মুখে। "কত যে সুখী ছিলাম!" "So happy" এই তাঁর শেষ কথা। সুখী? এত ঝড়-ঝাপটা, দুঃখ, আঘাত, বঞ্চনার পরও সুখী?

ইনি শার্লট ব্রন্টি। যাঁর লেখা 'জেন আয়ার' সে যুগে সাড়া তুলেছিল। 'কুরার বেল' ছদ্মনামের আড়ালে যিনি ইংলণ্ডের সবাইকে চমক লাগিয়েছিলেন। অবশ্য শার্লটকে জানতে হলে জানতে হয় এমিলি আর অ্যানকেও; শার্লটের ছোট দুই বোন। আসলে তিনজনে মিলেই ওঁরা এক, একজনকে বাদ দিয়ে আরেকজনকে ভাবাই যায় না। যে পরিবেশে ওঁরা বড় হয়ে উঠেছেন, সেই পরিবেশই ওঁদের এক করে দিয়েছে। সে পরিবেশ ইয়র্কশায়ারের পরিবেশ, সে পরিবেশ হাওয়ার্থ গ্রামে তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ।

বাবা প্যাট্রিক ব্রন্টি। আয়র্ল্যাণ্ডের চাষী ঘরের ছেলে। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের চেষ্টায় কেম্ব্রিজে লেখাপড়া শিখে পাদ্রী হয়েছিলেন। ১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইয়র্কশায়ারের ধূ-ধূ প্রান্তর পেরিয়ে তিনি এসেছিলেন হাওয়ার্থ গ্রামের পাদ্রী হয়ে। তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই তখন খুব ছোট।

পাহাড়-ঘেরা জনবিরল বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঠিক মাঝখানে হাওয়ার্থ গ্রাম। দুরন্ত শীত, দুরন্ত ঝড়, ঘন কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি-তুষারের

দেশ, হাওয়ার্থের প্রান্তরভূমিতে যেন মুক্তির আস্বাদ, জীবনের দুঃখ-বেদনা, হতাশা থেকে রেহাই। ঝড় আর প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই মনে এনে দেয় দুর্জয় আনন্দ। কঠিন পাহাড় আর জলাভূমি জোগায় সাহস। এইখানেই গড়ে উঠেছিল ব্রন্টি-শিশুদের কল্পনাপ্রবণ মন।

পাঁচ বোন এক ভাই, প্রায় পিঠোপিঠি। ছোট মেয়ে অ্যান হবার পর মা শয্যা নিলেন। বড় মেয়ে মারিয়ার বয়স তখন সাত। ছেলেবেলা কাকে বলে, বেচারি মারিয়ার তা জানবার সুযোগই মেলেনি। মারিয়া ভাইবোনদের আগলায়, মার কাছে থাকে, ছোটখাটো কাজ করে। তখন থেকেই মারিয়া যেন কত বড়। বয়সের তুলনায় বুদ্ধি বেশি; স্বভাবেও গম্ভীর।

মা মারা গেলেন। মাসী ব্রানওয়েল এলেন ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা তদ্বির করতে। কর্ণওয়ালের (Cornwall) চমৎকার আবহাওয়ায় থেকে তাঁর অভ্যাস, ইয়র্কশায়ারের এই বৃষ্টি, তুষার, কুয়াশা, ঝড়, থমথমে আবহাওয়া ভালো লাগবে কেন? ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে বেশির ভাগ সময় তিনি শোবার ঘরেই কাটান। মেয়েদের শিক্ষা-সহবতের জন্য অবশ্য অনেক করেছিলেন তিনি, কিন্তু মায়ের অভাব পূরণ করতে পারেননি।

হাওয়ার্থ একেবারে গণ্ডগ্রাম। মিঃ ব্রন্টির কোনো বন্ধুই ধারে-কাছে নেই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আরো আত্মসমাহিত, অসামাজিক ও ঘরকুনো হয়ে পড়লেন। হাওয়ার্থ গ্রামের প্রভাবও তাঁর উপর পড়লো। রাশভারী মেজাজ আরো চড়া, আরো গম্ভীর হয়ে উঠলো। মিঃ ব্রন্টির চরিত্রে ছিল কিছু আইরিশ আদিমতার ঝাঁঝ; অনমনীয় দৃঢ়তা আর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীনতা। রাগ হলে কাউকে কিছু বলতেন না, চেঁচামেচি করতেন না; হাতের কাছে যা পেতেন ছুঁড়ে ফেলে দিতেন, ছিঁড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে অথবা পুড়িয়ে ফেলতেন। পিস্তল ছিল নিত্যসঙ্গী, কখনো বা ঘন ঘন ফাঁকা আওয়াজ করতেন।

সে যুগে নৈতিক চরিত্র গড়ার দিকে বাবাদের শাসন ছিল বড় কড়া। ছেলেমেয়েরা যাতে সাদাসিধে ভাবে গড়ে ওঠে মিঃ ব্রন্টির সেদিকে খুব প্রখর নজর ছিল। ফলে থমথমে আবহাওয়ার মধ্যেই শিশুরা বড় হচ্ছিল। মেয়েরা সকলেই খুব শান্ত, ক্ষীণজীবী আর নরম প্রকৃতির। তাদের সমবয়সী আর কেউ নেই। ওরা জোরে কথা বলে না, দৌড়ঝাঁপ করে না। ছেলেবয়সের হাজার দুষ্টুমি ওদের আওতার বাইরে। বোঝাই যায় না বাড়িতে ওরা রয়েছে। চরিত্রগড়া নিয়ে মিঃ ব্রন্টি একটু বাড়াবাড়িই করতেন। একবার ভাইবোনেরা মাঠে বেড়াতে যাবার পর খুব বৃষ্টি শুরু হয়। নার্স ব্যস্ত হয়ে কয়েক জোড়া রঙীন চকচকে জুতো আগুনের পাশে এনে রাখলো। বেচারিরা খালি পায়ে গিয়েছে। ফিরে এলে প'রে আরাম পাবে। জুতোগুলো এক বন্ধু ওদের উপহার দিয়েছিলেন। বৃষ্টিতে শপশপে হয়ে ওরা ফিরলো। কিন্তু জুতো? কোথাও পাত্তা মিললো না। উনুনে পাওয়া গেল পোড়া চামড়ার কটু গন্ধ। ঘরে ঢুকেই ওগুলো মিঃ ব্রন্টির নজরে পড়েছিল। সর্বনাশ! বিলাসিতা, সাজগোজের দিকে মন? অতএব সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি আগুনে বিসর্জন।

স্নেহবঞ্চিত শিশুরা তাই নিজেরা পরস্পর আরো বেশি করে নিজেদের আঁকড়ে ধরে। নিজেরাই খাবার নিয়ে খায়, পড়াশুনা করে, ফিস্‌ফিস করে গল্প করে। বাড়িতে ভালো না লাগলে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ে মাঠে, ঘাটে, পাহাড়ে, জঙ্গলে। তাছাড়াও সময় তাদের কাটে পোষা জীবজন্তুদের নিয়ে। এমিলির ছিল বাঘা ম্যাস্টীফ কুকুর, নাম 'কীপার' বা রক্ষক; আর অ্যানের ছিল রেশমের মতো নরম কালো সাদা স্প্যানিয়েল—'ফ্লসী' বা রেশমী; এছাড়াও ছিল অনেক বেড়ালবাচ্চা, ক্যানারি পাখি, রাজহাঁস আর বাজপাখি।

মেয়েদের বুদ্ধি আর প্রতিভা সম্বন্ধে বাবা কিন্তু উদাসীন ছিলেন না। বরং গর্ববোধই করতেন। ওদের চিন্তা ও ধীশক্তি বাড়ছে কিনা যাচাই করতেন মাঝে মাঝে, ডেকে ডেকে নানান ধরনের প্রশ্ন করতেন তাদের। একবার এমনি ধরনের প্রশ্ন করে এমন জবাব পেয়েছিলেন

যে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ছোট মেয়ে অ্যানকে দিয়েই প্রশ্ন শুরু হয়েছিল। অ্যানের বয়স তখন সবে চার বছর। চটপট জবাব অ্যানের, যেন কত অভিজ্ঞ। এমিলিকে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বলোতো তোমার ভাই ব্রানওয়েল মাঝে মাঝে বড় দুষ্টুমি করে, তাকে নিয়ে কী করা যায়?

—যুক্তি দিয়ে বোঝাও। এতে কাজ না হলে চাবুক মারো।

ব্রানওয়েলকে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলে আর মেয়ের বুদ্ধির তফাৎ কী করে বোঝা যায়?

—কেন, ওদের শরীরের তফাৎ যে ভাবে লোকে বোঝে। শার্লটকে প্রশ্ন করা হলো—পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ বই কোন্‌টি?

উত্তর পেলেন—বাইবেল।

—তারপর কোন্ বই?

—প্রকৃতি।

এলিজাবেথকে জিজ্ঞাসা করলেন—মেয়েদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কী?

—যে শিক্ষা তাদের ঘরসংসার সুন্দরভাবে করতে শেখায় তাই।

বড় মেয়ে মারিয়াকে প্রশ্ন করলেন—সময় কাটানোর সবচেয়ে ভালো উপায় কী?

সে উত্তর দিল—চিরকাল যাতে সুখে কাটে এমনভাবে ছক করা।

চার থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের মুখে এমন সব কথা! বাবা একেবারে তাজ্জব।

এমনি প্রখর বুদ্ধি আর অনুভূতি নিয়ে লোকসমাজের আড়ালে ওরা বড় হচ্ছিল। ওরা বাইরের খবর জোগাড় করতো খবরের কাগজ পড়ে। এমন খুঁটিয়ে পড়তো যে বড়রাও যে-কোনো বিষয় নিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে এলে আশ্চর্য হতেন।

হাওয়ার্থ গ্রামে কোনো সংস্কৃতি নেই, শিক্ষা নেই। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সেখানে বিশেষ কেউ থাকেন না। বাসিন্দাদের বেশির ভাগই কাপড়ের কলের মালিক,—যারা টাকা থাকলেও লেখাপড়ার ধার ধারে না। ব্রন্টিরা তাই এ-গ্রামের বাসিন্দা হয়েও পুরো বাসিন্দা

নয়। গ্রামের সবই ভালো এ তারা মানতে পারে না। মাসীর কাছে শোনে কর্ণওয়ালের গল্প, বাবার কাছে আয়র্ল্যাণ্ডের। ইয়র্কশায়ারকে ভালোবাসলেও তাই ওদের মনে হয় এই ইয়র্কশায়ারই সব নয়, এর বাইরেও তুনিয়া আছে।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা ভাবছিলেন মিঃ ব্রন্টি। ছেলেকে তিনি নিজেই প্রথম পাঠ দিতে পারবেন। ছোট মেয়ে অ্যান বড়ই ছোট। স্কুলে যাবার বয়সই হয়নি। কিন্তু মারিয়া, এলিজাবেথ, শার্লট আর এমিলি? ওদের কী ব্যবস্থা করা যায়? পাদ্রী হিসাবে তাঁর আয় মাত্র তুশো পাউণ্ড; ঐ আয়ে কোনো ভালো স্কুলে মেয়েদের পড়ানোর কথা ভাবাই যায় না। কানে এলো কোয়ানব্রীজ স্কুলের কথা। সেখানে নাকি সস্তায় গরীব পাদ্রীদের ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে। তাদের জন্যই বিশেষ করে স্কুলটি তৈরি। এই সস্তার স্কুলেই চার মেয়েকে তিনি পাঠালেন। বয়স আর তাদের কত? মারিয়া দশ, এলিজাবেথ নয়, শার্লট আট, এমিলি পুরো সাতও নয়।

কোয়ানব্রীজ (Cowan Bridge)। সস্তার তিন অবস্থা। যেমন নোংরা, স্যাঁতসেঁতে, অস্বাস্থ্যকর, তেমনি পরিচালনার অব্যবস্থা। প্রায় একশো বছরের পুরোনো। পাথরের মেঝে, কার্পেট নেই, আগুন নেই। ভীষণ ঠাণ্ডা। তবু মেয়েরা খুশি মনেই এসেছিল। বাড়িতে বসে বসে তুবেলা মাসীর কাছে ঘরকন্নার কাজ, সেলাই আর আদব-কায়দা শেখার চেয়ে ঢের ভালো।. কিন্তু স্কুলে এসে যা দেখলো তাতে তারা নিরাশ হলো। খিদের সময় পুরো খাবার পাওয়া যায় না। হাড়ভাঙা শীতে উপযুক্ত পোষাক নেই, জুতো নেই, দস্তানা নেই। শীতের চোটে হাত পা অসাড় হয়ে যায়, ফোস্কা পড়ে। আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে তো হয়ই তার ওপর বড় মেয়েরা ছোটদের ভুলিয়ে তাদের খাবারের ভাগটাও নিয়ে নেয়। শার্লটের 'জেন আয়ার' (Jane Eyre) উপন্যাসে এই তুর্দশারই অবিকল বর্ণনা পাওয়া যায়।

মা বাবাকে ছেড়ে এতদূরে এসে কোয়ানব্রীজ স্কুলের মেয়েদের তুঃখের অবধি ছিল না। প্রায়ই নানারকম অসুখ বিসুখ দেখা দিত। যারা

দুর্বল, রোগা তারাই বেশি ভুগতো। মারিয়া আর এলিজাবেথ প্রথম থেকেই রোগা। সর্দি কাশি, ঠাণ্ডা লাগার ধাত। কেউই অবশ্য জানতো না যে আগে থেকেই দুরন্ত ক্ষয়রোগের জীবাণু ওদের বুকে বাসা বেঁধে আছে। কিছুদিনের মধ্যেই মারিয়া খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। ১৮২৫ সালের বসন্তকালে অবস্থা তার এমন দাঁড়ালো যে মিঃ ব্রন্টিকে খবর দিয়ে আনাতে হলো। তিনি এপর্যন্ত ওর অসুখ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। মেয়ের অবস্থা দেখে মনে খুব আঘাত পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মারিয়াকে তিনি বাড়ি নিয়ে এলেন। কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না, বাড়ি আসবার অল্পদিনের মধ্যেই মারিয়া মারা গেল।

এবার এলিজাবেথের দিকে সকলের নজর গেল। এরও তো সব লক্ষণ মারিয়ার মতোই। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এলিজাবেথকে বাড়ি পাঠালেন। সেই বছরের গ্রীষ্মকালে এলিজাবেথও মারা গেল।

এতদিন ছিল মারিয়া; এবার মা-হারা ভাইবোনদের ভার পড়লো শার্লটের ওপর। হঠাৎ যেন সে বড় হয়ে উঠলো। মারিয়ার মতোই যত্নে, আদরে ভাইবোনদের দুঃখ ভোলাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

গ্রীষ্মের ছুটি ফুরোলো। শার্লট আর এমিলি আবার ফিরলো কোয়ানব্রীজে। মারিয়া আর এলিজাবেথের স্মৃতিতে ভরা কোয়ানব্রীজ এবার আরো অসহ্য। স্বাস্থ্য ওদেরও ভালো যাচ্ছিল না। ফলে দুজনেই স্কুল ছেড়ে অচিরেই চলে এলো বাড়িতে।

দুই

ন বছরের শালট আর তার তদারকিতে এমিলি, প্যাট্রিক, ব্রানওয়েল আর অ্যান। পাঁচ পাঁচটি বছর এইভাবেই ওদের কাটলো। অন্যের চোখে কিছু বিশেষত্ব ধরা পড়লো না বটে, কিন্তু অসাধারণ কল্পনা-প্রবণতায় ওরা ছিল সবার থেকে আলাদা। সৃজনীশক্তির অঙ্কুর নিয়ে যারা জন্মেছে তাদের কাছে এই পাঁচবছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কারণ তাদের রহস্যময় গোপন শিল্পীজীবন এই সময় থেকেই শুরু।

জন্ম থেকেই এঁরা জেনেছে দারিদ্র্য। বঞ্চিত হয়েছে মায়ের স্নেহে। শৈশবেব সোনার স্বপ্ন ঢেকে যেতে দেখেছে মৃত্যুর কালিমায়। এরাও তাই পরোয়া করবে না কোনোকিছু। জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে ডুবে যাবে দিবাস্বপ্নের রাজ্যে। সেখানে তারাই সম্রাজ্ঞী, সুখী ও স্বাধীন। তাদের 'সব পেয়েছির দেশে' তারা যা খুশি করুক, যা খুশি বলুক, বাধা দেবার কেউ নেই। ব্রন্টি ভাইবোনদের এই স্বপ্নজগৎ ছিল অন্য শিশুদের কল্পনার জগৎ থেকে পৃথক। ব্রন্টি-ভাইবোনেরা শুধু কল্পনা করেই তৃপ্ত হয়নি, যা কিছু মনে এসেছে, যা কিছু তাদের ভাবনা চিন্তা কল্পনা, সব লিখে লিখে রেখেছে।

দিবাস্বপ্ন বা আজগুবি কল্পনা যখন বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক হারায় তখনি আসে বিপদ, জীবনের সুস্থতা নষ্ট হতে থাকে। ব্রানওয়েলের জীবনে এই অতিকল্পনা ডেকে এনেছিল অশুভ। এমিলির কাছেও কাব্যিক জীবনই ছিল একমাত্র সত্য, কিন্তু তার কল্পনার রাজ্যকে অতি-কল্পনা বা অবাস্তব বলা যায় না। অ্যানের ধর্মপ্রীতির আতিশয্যও একেবারে মাত্রা ছাড়ায়নি। শার্লট সচেতনভাবে চেষ্টা করে করে নিজেকে এর হাত থেকে মুক্ত করেছিল; এবং ১৮৩৯ সালেই তার কল্পরাজ্য 'অ্যাংগ্রিয়া'র কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে পেরেছিল।

এদের রহস্যময় জগতে সেইসব ঘটনাই ঘটতো যা সচরাচর ঘটে না বা ঘটতে দেখা যায় না। দিনরাত ওরা ওই সব নিয়েই মশগুল থাকতো। ওদের খুশি করার জন্য বাইরের কেউ ব্যস্ত নয়। ওদের তাতে কিছু যায় আসে না। ওরা নিজেরাই খুশি হয়ে উঠতে জানে। খুশি হবার উপায় ওদের নিজেদের হাতেই রয়েছে। তাছাড়া বাড়িতে বাবার কাছে কেউ এলে কথাবার্তা হয়, দুএকটা ওদেরও কানে যায় এবং তাতেই ওরা খুশি। ট্যাবি ওদের রাঁধুনী, তার কাছে বসে পুরোনো দিনের গল্প শুনতেও ওদের খুব আনন্দ।

ট্যাবি কানে কম শোনে। অথচ বাড়ির সব কথাই তার শোনা চাই। হয়তো আর কারো শোনা উচিত নয় এমন কোনো কথা সে জানতে চায়। ট্যাবিকে বলা মানে বাড়িশুদ্ধ, এমনকি পাড়াশুদ্ধ,

সবাইকে শুনিয়ে বলা। মুস্কিলে পড়তে হয়। না বললে আবার ট্যাবি চটে যায়। শার্লট শেষে এক উপায় বের করলো। কোনো কথা বলতে হলে ট্যাবিকে নিয়ে চলে যেতো নির্জন জায়গায় বাড়ির বাইরে এবং তাকে কাছে বসিয়ে সমস্ত কথা শুনিয়ে বাড়ি ফিরতো।

মিস ব্রানওয়েল ওদের দেখাশোনা করতেন। শোবার ঘরই ছিল পড়ার ঘর। বাইরের খবর কিছু কিছু বাবা গল্প করে বলতেন। তাঁর স্বাধীন ও স্পষ্ট মতামতে ছেলেমেয়েরাও চিন্তার খোরাক খুঁজে পেতো। এমিলির চাইতে মাত্র আঠারো মাসের বড় শার্লট। কিন্তু এমিলি আর অ্যান যেখানে খেলার সঙ্গী মাত্র, শার্লট সেখানে ওদের মা, বন্ধু, অভিভাবিকা। স্নেহের এই দায়িত্ব বয়সের তুলনায় তার মনের বয়সকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ওদের জগতে সাহিত্যের যে খেলা চলতো তা ছিল ওদের সবচেয়ে গোপন কথা। কেউ যেন না জানে, কেউ যেন না শোনে। তৈরি হতো ইতিহাস, নাটক, গল্প, কবিতা। কত যত্নে, ধৈর্যের সঙ্গে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ছোট্ট বইএর আকারে সেসব লেখা হতো। কোনো কোনো বইএর আবার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাত্র দু' ইঞ্চি করে। এইসব বই সুতো দিয়ে খুব সন্তর্পণে সেলাই করে, পাতলা কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া হতো। কতগুলো হতো আবার আকারে একটু বড়। ফুল লতাপাতা আঁকা, সূচিপত্র দেওয়া। কবে, কখন, কীভাবে এই খেলার পত্তন হলো শার্লটের লেখায় তা জানা যায়ঃ—

"আমাদের নাটকগুলি লেখা হয়, 'Young Men' June 1816, 'Our Fellows' July 1827, 'Islanders' Dec. 1827....The Young Men's Play শুরু হয় ব্রানওয়েলের কতগুলো কাঠের সৈন্য দিয়ে; 'Our Fellows' লেখা হয় ঈশপের গল্প থেকে; 'Islanders' লেখা হয় কতগুলো ঘটনা থেকে। এখন কীভাবে এগুলো প্রথম আরম্ভ হলো বলা যাক। প্রথম 'Young Men'; ব্রানওয়েলের জন্য লীডস্ থেকে বাবা কতগুলো কাঠের সৈন্য এনেছিলেন। যখন বাবা বাড়ি এলেন তখন রাত হয়েছে। আমরা শুয়ে পড়েছি। সকাল বেলা

ব্রানওয়েল একবাক্স কাঠের সৈন্য নিয়ে আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ালো। এমিলি আর আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলাম। একটা সৈন্য হাতে তুলে নিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম 'এটা হচ্ছে ডিউক অব ওয়েলিংটন। এটাই হবে ডিউক।' আমি একথা বলার পর এমিলিও একটা হাতে নিয়ে বললো, এটা তার। অ্যান এসেও একটা তার জন্যে নিল।"

ব্রানওয়েল তার 'History of the Young Men'-এ বর্ণনা করেছে কেমন করে বারোটি কাঠের সৈন্য আফ্রিকার উপকূলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো। শার্লটের প্রিয় ডিউক অব ওয়েলিংটন সেখানকার রাজা। তিনি যে শহর পত্তন করলেন তার নাম 'কাচের শহর' (glass city)। এই বারোজনকে আবার চারজন প্রধান দৈত্য সব কাজে সাহায্য করতো। তাদের নাম তাল্লি (Talli), ব্রান্নি (Branni), এম্মি (Emmi) আর আন্নি (Anni) অর্থাৎ শার্লট, ব্রানওয়েল, এমিলি আর অ্যান। বারোজন সৈন্যের অনুবর্তীরা আবার বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যস্থাপন করেছিল। কিন্তু রাজধানী তাদের ছিল কাচের শহর।

কাচের শহর একটি ছোটখাটো পৃথিবী। এখানে খবরের কাগজ, পত্রিকা, ছবি, রাজনীতি, কবি, ঐতিহাসিক, প্রকাশক, বই বিক্রেতা, অভিনেত্রী, সেনাপতি—কিছুরই অভাব নেই। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে রোমান্স নিয়ে লিখেছে শার্লট; রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে লিখলো ব্রানওয়েল। 'Young Men' পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যা ওরা বের করেছিল। কবিতা, বিখ্যাত লোকদের চরিত্রচিত্রণ, প্রবন্ধ, গল্প, ইতিহাস, নতুন বইএর সমালোচনা, নতুন আঁকা ছবির খবর, এমন কি বিজ্ঞাপন পর্যন্ত এই পত্রিকায় থাকতো। লেখাগুলিতে যেমন অপূর্ব কল্পনা, তেমনি অপূর্ব গদ্যের স্টাইল। কতকগুলি লেখায় পাওয়া যায় ঘরোয়া পরিবেশ। 'Tales of the Islanders'এর ভূমিকায় শার্লট লিখছে:

"৩১শে জুন, ১৮২৯

'The Play of Islanders' এই ভাবে শুরু হয়েছিল। একদিন

রাত্রে নভেম্বর মাসের ঝড় আর কুয়াশা; তুষার আর শিলাবৃষ্টি। বাতাস গায়ে কাঁটা বেঁধাচ্ছে। আমরা রান্নাঘরে উনুনের ধারে বসে। এইমাত্র ট্যাবির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। আমাদের মোমবাতি জ্বালতে দেবেনা। মোমবাতিগুলো সব কোথায় সরিয়ে রেখেছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ। অলসভাবে ব্রানওয়েল বলে উঠলো "কী করা যায় এখন?" এমিলি আর অ্যানও ঐ কথাই বললো।

ট্যাবি—কেন, শুতে যাওনা।

ব্রানওয়েল—ঐটি ছাড়া আর সব কিছু করবো।

শার্লট—আজ এত চটে আছো কেন ট্যাবি?… হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে। ভাবোনা কেন আমাদের প্রত্যেকের একটা করে দ্বীপ রয়েছে।

ব্রানওয়েল—তাই যদি হয় আমি বাছবো ম্যান দ্বীপ (Isle of Man)।

শার্লট—আমি নেবো ওয়াইট দ্বীপ (Isle of Wight)।

এমিলি—আমার হবে আরান দ্বীপ (Isle of Arran)।

অ্যান—আমার গুয়েরনসি (Guernsey)।

বিশেষ বিশেষ লোক কারা কোথায় থাকবে, এবার সেটা বাছবার পালা। ব্রানওয়েলের পছন্দ জন বুল (John Bull), অ্যাশট্‌লি কুপার (Ashtley Cooper), আর লী হাণ্ট (Ligh Hunt); এমিলির ওয়াল্টার স্কট (Walter Scott), মিঃ লকহার্ট (Mr. Lockhart), জনি লকহার্ট (Johnny Lockhart); অ্যানের মাইকেল স্যাডলার (Michael Sadler), লর্ড বেন্টিক (Lord Bentinck), সার হেনরী হাফোর্ড (Sir Henry Halford); আমি বাছলাম ডিউক অব ওয়েলিংটন আর তাঁর দুই ছেলে, ক্রিষ্টোফার নর্থ অ্যাণ্ড কোম্পানী (Cristopher North & Co) আর মিঃ অ্যাবারনেথী (Mr. Abernethy)। এখানেই আমাদের আলোচনায় বাধা পড়লো। বিশ্রী শব্দ করে ঘড়িতে সাতটা বাজলো। আমাদের শুতে যাবার হুকুম হলো।"…

শার্লট এই সব লেখা সারাজীবন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। টেক্সাস (Texas) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মিস এফ. ই. র‍্যাচফোর্ড (F. E. Ratchford) এগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে ১৮২৯-১৮৪৫ সন পর্যন্ত এই ধরনের লেখায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ইতিহাস আর নাটকের মধ্যে বেশ সুন্দর ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। তাছাড়া সবগুলিরই পটভূমি ও চরিত্র এক।

কল্পনার উদ্দাম জোয়ারে সামান্য ঘটনা, সামান্য জিনিস অসামান্য হয়ে দেখা দেয় ওদের কাছে। আরব্য উপন্যাস পড়ে নিজেদেরই তারা মনে করে এক একজন দৈত্যের সর্দার। অসীম ক্ষমতা তাদের। তারা পারে যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করতে, পারে মরাকে বাঁচাতে। তারা যাদুমন্ত্র জানে। বিদ্যুতের পাখায় ভর করে নামে, বজ্রের আওয়াজে প্রভুদের কাছে দেখা দিয়ে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেয়:

"আমি ব্রান্নি, দৈত্যদের সর্দার। আমার সঙ্গে আরো তিনজন আছে। ওয়েলেসলী, তোমাকে যে বাঁচাবে তার নাম তাল্লি, প্যারীকে যে বাঁচাবে সে এম্মি; রস্‌কে বাঁচাবে আন্নি। এছাড়া আর যাদের দেখছো এরা সব সাধারণ দৈত্য আর পরী। ওরা আমাদের কাজ করে। হুকুম মেনে চলে···। আমরাই তোমাদের অভিভাবক।"

শার্লট আর ব্রানওয়েলের মাথা থেকেই প্রথমে সব বেরোতো। অ্যান বা এমিলির এ সময়কার কোনো লেখা পাওয়া যায় না, হয়তো তারা তখন খুব ছোট ছিল বলেই। শার্লট আবার স্কুলে যাবার পর ওরা দু'জন আলাদাভাবে এই খেলা আরম্ভ করে। ব্রানওয়েল তখন নিজে নিজে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলতো। ১৮৩১ সনের জানুয়ারি থেকে এটা আরম্ভ হয়।

শার্লটের বয়স তখন পনেরো। হাওয়ার্থ থেকে কুড়ি মাইল দূরে রো-হেড স্কুলে (Roe Head School) তাকে পাঠানো হলো। কেবল শার্লটকেই পাঠানো হলো কেন? হয়তো মাত্র একজনকে পাঠানোর খরচই জোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল। কারণ এলিজাবেথ আর অ্যানের ধর্ম-মা এলিজাবেথ ফার্থ (Elizabeth Firth) বলেছিলেন

মেয়েদের মধ্যে যে কোনো একজনের পড়ার খরচ তিনি দেবেন। সেই একজন হলো শার্লট।

বাড়ি ছেড়ে যেতে সে কী মন খারাপ। লাজুক স্বভাব; অচেনা মুখের সামনে দাঁড়ানোর চিন্তায় শার্লট কাতর। তবু সান্ত্বনা, লেখাপড়া শিখবার সুযোগ মিলছে। শিক্ষার দিকে ব্রন্টি-পরিবারের আগ্রহ মজ্জাগত। এ তাদের কেল্টিক (Celtic) বিশেষত্ব। বাবার মতো মেয়েরাও সব কিছুর চাইতে শিক্ষাকেই বড় মনে করতো। তারা চাইতো দারিদ্র্যকে দুহাতে ঠেলে দুর্জয় প্রতিজ্ঞায় এগোতে।

এবার বাড়ী ছেড়ে দূরে থাকার পালা। ফলে তাদের এতদিনকার গড়ে তোলা গোপন খেলার সাম্রাজ্য ভেঙে গেল। কত ইতিহাস, কত দুঃসাহসিক অভিযান সব শেষ হয়ে গেল। দুঃখে ওদের মন ভরে গিয়েছিল, কিন্তু তবু ওরা স্বেচ্ছায় তাদের কাচের শহর ভেঙে দিল। যাবার আগে শার্লট তো রীতিমতো কবিতা লিখে কাচের শহরের কাছ থেকে বিদায় নিল!

তিন

মিস উলারের (Miss Wooler) স্কুল রো-হেড (Roe Head) মোটামুটি সব দিক দিয়েই ভালো, ছাত্রীসংখ্যা কম, ক্লাশও ছোট, সব মিলিয়ে বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশ। শার্লটের লেখাপড়ার দিকে আগ্রহ দেখে মিস উলার তাকে খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। শার্লটের সুবিধেই হলো। এখানে গভর্নেস হবার উপযুক্ত শিক্ষা সে পেতে পাবে। স্বাধীনভাবে থাকবার জন্য রোজগারের কোনো রোমান্টিক কল্পনা তার ছিল না। কিন্তু স্বয়ংনির্ভর হওয়া দরকার ওদের প্রত্যেকেরই। দুশো পাউণ্ড আয়ের সংসারের মেয়ে হয়ে কী করে চুপ করে বসে থাকা যায়? বাবা যখন থাকবেন না? তখনকার দিনে মেয়েদের একমাত্র সম্মানের কাজই গভর্নেস হওয়া। রো-হেডে এলেন-নাসি (Ellen Nussey) আর মেরী-টেলর (Mary Taylor) নামে দুটি মেয়ের সঙ্গে শার্লটের বন্ধুত্ব হয়। এলেনের সঙ্গে হয়েছিল মনের মিল।

মেরী টেলরের সঙ্গে বুদ্ধির। এলেন আর মেরীর কাছে লেখা বহু চিঠিপত্র থেকে পরে শার্লট সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। শিক্ষকতার কাজে শার্লট ছিলেন একেবারেই অনুপযুক্ত। একে লাজুক, তার উপর চেহারা সুশ্রী নয় বলে লোকসমাজে বেরোতে সঙ্কোচ। কিন্তু গভর্নেস হতে হলে চাই অটুট স্বাস্থ্য। শার্লটের তা নেই। শার্লট মাথায় ছোট, ক্ষীণস্বাস্থ্য এবং একেবারেই সাদামাটা তার চেহারা। তবু অন্য উপায় যখন নেই তখন এরি জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে বৈকি। রো-হেডে কাটলো পুরো আঠারো মাস।

আঠারো মাস পরে আবার ভাইবোনদের সঙ্গে মিলন, আবার ফিরে পাওয়া রহস্যলোকের চাবি, আবার চললো কল্পনার মধ্যে ডুবে যাওয়া। এবার আবেগের গাঢ়তা শার্লটের আরো বেশি এবং গোপনীয়তার দরকারও তাই খুব বেশি।

আবার গড়ে উঠলো কাচের শহর। কিন্তু এমিলি আর অ্যান এতে যোগ দিল না। আলাদাভাবে ওরা দুজন তখন নতুন শহর গড়েছে। শার্লট আর ব্রানওয়েলের নতুন রাজ্য অ্যাংগ্রিয়া (Angria) থেকে ওদের গোণ্ডালরাজ্যের (Gondal) অনেক তফাৎ।

কাচের শহরের পুবদিকে 'অ্যাংগ্রিয়া'। জামোর্নার ডিউক (Duke of Zamorna) আর নর্দ্যাংগারল্যাণ্ডের ডিউক (Duke of Northangerland) এটা দখল করে নিয়েছে। এরা দুজন পরস্পরের শত্রু। দুজনেই অসৎ, নিষ্ঠুর ; বায়রনের খল নায়কের মতো মেয়েদের ওরা মুগ্ধ করে। এদের নিয়ে, অবৈধ প্রেম নিয়ে, শার্লট গল্প আর কবিতা লিখতো। ব্রানওয়েল লিখতো রাজনীতি আর লড়াই নিয়ে। ভবিষ্যতে শার্লটের ভিক্টোরীয় পিউরিটান মন যেসব আচরণ ও কাজের নিন্দা করেছে সে সবই কিন্তু অ্যাংগ্রিয়ায় অনায়াসে ছাড়পত্র পেয়েছে এবং রীতিমতো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

গোণ্ডাল (Gondal) উত্তরের দেশ। ধূ-ধূ প্রান্তর, কুয়াশা, বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ার রাজ্য। গোণ্ডালের রাণীর অসীম ক্ষমতা। মনে তার প্রবল কামনা আর আবেগ। সব সময় তা আইন মেনেও

চলে না। রাণীর কাজের ফলাফল পৃথিবীতে বর্তায়। ভালো করলে ভালো ফল, মন্দ করলে মন্দ ফল—এই হচ্ছে এমিলির গোণ্ডাল রাজ্যের বিধান। সেখানকার লোকদের ভাগ্যও ভালোমন্দের মিশ্রণ।

কল্পরাজ্যের মধ্যেই ওরা ডুবে থাকে। এমিলি হয়তো কার্পেট ঝাড়ছে, অ্যান সেলাই নিয়ে মগ্ন, শার্লট ইস্ত্রি করায় ব্যস্ত ; মন কিন্তু ওদের অনেক দূরে। বাইরে থেকে দেখলে ওরা বাধ্য, সংযত, আচরণে ভদ্র, নিরীহ, শান্ত। কিন্তু মনের মধ্যে ওরা রাজ্য জয় করছে, রাজ্য চালনা সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছে, আর সেগুলো দিয়ে কীভাবে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ লিখবে তাই ভাবছে।

অ্যাংগ্রিয়া আর গোণ্ডালের নীতির তফাৎ থেকেই শার্লট আর এমিলির কবিতা, উপন্যাসের তফাৎ বোঝা যায়। শার্লটের মধ্যে দুরকম মনোভাব। 'অ্যাংগ্রিয়া'তে যা সে প্রশংসা করেছে, ভালোবেসেছে, পরবর্তীকালের উপন্যাসে তারই নিন্দে করেছে জোরালো গলায়। বিবাহবন্ধন ছাড়া রচেষ্টারের (Rochester) প্রেয়সী হিসাবে থাকা মিস আয়ারের পক্ষে অসম্ভব ; লুসি স্নোর (Lucy Snowe) চকচকে রেশমের পোষাকে গভীর বিতৃষ্ণা। অ্যাংগ্রিয়ায় কিন্তু অবৈধ প্রেমেরই জয়গান। জামোরনা আর নর্দ্যাংগারল্যাণ্ডের স্ত্রীদের গায়ে ঝলমলে পোষাক আর মণিমুক্তোর গয়না। এমিলির মধ্যে এই ধরনের মনোভাব একেবারেই নেই। গোণ্ডালের রাণী অগাস্টা (Augusta) কিংবা 'Wuthering Heights'এর হীথক্লিফের (Heathcliffe) চরিত্রের জন্য এমিলি কখনো ওদের দোষ দেয়নি, অবশ্য জোর গলায় সমর্থনও জানায়নি।

অ্যানের মধ্যে ধর্মভীরুতা খুব বেশি। অল্পবিস্তর সকলের মধ্যেই ধর্মের ভাব। ওদের কবিতার মধ্যে, বিশেষ করে এমিলির লেখায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যানের মনে অদ্ভুত রকমের আত্মকৃচ্ছ্রতা। নরকের ভয়ে সব সময় সে তটস্থ। এই অহেতুক ভয় তার জীবনের সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছিল। এমিলির মধ্যে ওসবের বালাই নেই। হার্ডির কোরাসের মতো সুদূর থেকে সে মানুষের দিকে তাকায়।

কোরাসের মতোই নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার আর কঠিন করুণা তার মনকে অধিকার করে রাখে।

চার

বই পড়ার অভ্যেস সকলেরই। বাড়িতেই অনেক বই। তাছাড়া লাইব্রেরী থেকে বই এনেও ওরা পড়তো। আর লেখালেখা খেলা তো চলতোই। এই সময়কার কতগুলি কবিতা সাহসে ভর করে কবি সাদে-র (Southey) কাছে পাঠিয়ে মতামত চেয়েছিল শার্লট। সাদে ওকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। লিখেছিলেন, "কবিতা লেখার হাত তোমার আছে কিন্তু দিবাস্বপ্নের আতিশয্য বিপজ্জনক। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই না থাকলে পৃথিবী যে তোমার কাছে অর্থহীন মনে হবে। সবকিছুর অযোগ্য হয়ে পড়বে তুমি।"...

শার্লট এই জবাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তবে সান্ত্বনাও ছিল তার, কারণ কবি সাদে তার কাব্য প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন।

১৮৩৫ সাল। ইতিমধ্যে শার্লট বড় হয়েছেন। মিস উলার তাঁর স্কুলে পড়ানোর জন্য শার্লটকে ডেকে পাঠালেন। শার্লট রাজি থাকলে আরেকটি বোনও সেখানে পড়বার সুবিধা পাবে। শার্লটের সঙ্গে এমিলিও গেল রো-হেড স্কুলে। কিন্তু এমিলির সঙ্গে হাওয়ার্থের নাড়ির বন্ধন। বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও থাকা তার পোষায় না। তাছাড়া স্কুলের নিয়মকানুনের বেড়াজালে তার স্বাধীন মন হাঁপিয়ে ওঠে। প্রতিদিন সকালে উঠেই তার বাড়ির কথা মনে পড়ে। মাঠ, ঘাট, পাহাড়ের মায়া দিনরাত তাকে টানে। সারাদিনই তার মন খারাপ। বাড়ীর কথা ভেবে ভেবে তার শরীর ভেঙে পড়লো, সে দিন দিন রোগা আর দুর্বল হয়ে যেতে লাগলো। শার্লটের ভয় হলো। এমিলিকে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিল, নিয়ে এল অ্যানকে।

শার্লটের এবার দুঃখের দিন। পড়ানোর কাজ মোটেই পছন্দ নয়, অথচ তাই করতে হচ্ছে। দিবাস্বপ্নের মধ্যে আরো ডুবে গেল শার্লট। ক্রমশ শার্লটকে নিউরাস্থেনিয়া (Neurasthenia) রোগ ধরলো।

সবচেয়ে বড় কারণ প্রতিদিনের আনন্দহীন কাজের মধ্যে সৃজনী শক্তির অপচয়। শার্লটের বয়স এখন কুড়ি। ছেলেবেলা থেকে অফুরন্ত লেখা লিখে চলেছে। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সে রীতিমতো সচেতন, মনে প্রতিভা বিকাশের ব্যাকুল আগ্রহ। ঠিক সেই সময়ে বাড়ি ছেড়ে, লেখা ছেড়ে, অবসরকে ভুলে, চলে আসতে হলো। রোজই একঘেয়ে ক্লাশ নেওয়া, খাতা দেখা, ছাত্রীদের তদ্বির করা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত। শরীরে পোষায় না। বিরক্তি ও হতাশা জমে ওঠে। শরীর আর মনের জোর কমতে থাকে। অ্যানও এই সময়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। মারিয়া আর এলিজাবেথের স্মৃতি অলক্ষিতে মনে পড়ে, আর শার্লট কেবলি ঘাবড়ে যেতে থাকে। মিস উলারের সঙ্গে ঝগড়া হয় অ্যানের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া হচ্ছেনা বলে। এইতো কিছুদিন আগেও অ্যানের বেশ বড় রকম অসুখ করেছিল। তাই এবার অসুখের পর শার্লট অ্যানকে বাড়িতেই রেখে এল।

মিস উলার আরেকটু ভালো জায়গা ডিউসবেরিতে (Dewsbury) স্কুল উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। শার্লটের কিন্তু শরীরের জন্য বেশিদিন থাকা হলোনা সেখানে। মন হয়ে পড়লো বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল; অজানা সামান্য শব্দেও সে চমকে চমকে ওঠে, সারা গা থরথর করে কাঁপে। ডাক্তারের পরামর্শে বাড়ি চলে এল শার্লট, মিলিত হলো ভাইবোনদের সঙ্গে। হাওয়ার্থের বাড়িতে চার ভাই বোনের এই শেষ মিলন।

বাড়িতে এসেই শার্লট সংসারের কাজে উঠেপড়ে লাগলো। ট্যাবির বয়স হয়েছে। তার উপর পড়ে গিয়ে পা ভেঙে কাজের ক্ষেত্রে অচল। ঝি-চাকর রাখবার মতো অবস্থা নয়। মেয়েরাই রান্না, ঘরের কাজ, ট্যাবির শুশ্রূষা সব করতে লাগলো।

মিঃ ব্রন্টির শরীরও ভেঙে যাচ্ছে। চার্চের সব কাজ একা করে উঠতে পারেন না। ব্রানওয়েল সম্বন্ধে এককালে অনেক আশা ছিল তাঁর। কিন্তু প্রচুর গুণ থাকা সত্ত্বেও ভুল পথে চলে ব্রানওয়েল তাঁকে দুঃখই দিল। চার্চের কাজের জন্য সে একেবারেই অনুপযুক্ত। মিঃ ব্রন্টি তাই একজন সহকারীর জন্য আবেদন জানালেন।

সহকারী পাদ্রী হয়ে প্রথম এলেন রেভারেণ্ড উইলিয়ম ওয়েটম্যান (Rev. William Weightman)। হাসিখুশি সদালাপী। সকলের সঙ্গেই বন্ধুর মতো ব্যবহার, বিশেষত মেয়েদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের তো তুলনা হয়না। যেমন রসিক, তেমনি পণ্ডিত। হাওয়ার্থ গ্রামের সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে পড়লো। শার্লট তাঁকে পছন্দ করতো, এমনকি এমিলিও তাঁর গুণমুগ্ধ। অ্যানের ভাবগতিক দেখে মনে হতো সে বোধহয় প্রেমেই পড়েছে। ব্রণ্টি পরিবারে বলতে গেলে একমাত্র উইলিয়ম ওয়েটম্যানই এনেছিলেন তারুণ্যের স্বাভাবিক আনন্দ ও দীপ্তি।

মাঝে মাঝে শার্লটের বিয়ের প্রস্তাব ওঠে। বিয়ে করলে অনেক দুর্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু তেইশ বছরের তরুণীর মনে তখন রোমান্সের রঙীন স্বপ্ন। সে স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ সাধারণ মানুষের পক্ষে কি সম্ভব? এদিকে উপার্জনের কথাও ভাবতে হয়। ভালো না লাগলেও গভর্নেসের কাজ নিয়ে বাইরে যেতেই হবে। অ্যানেরও সেই পরিকল্পনা। ১৮৩৯ সনের এপ্রিলে অ্যান চললো মিসেস ইনগ্রামের বাড়ীতে, পরের মাসে শার্লট কাজ পেল ষ্টোনগ্যাপ-এর (Stonegappe) মিসেস সিজউইকের (Sidgwick) বাড়িতে।

গভর্নেসের জীবন বড় কষ্টের। সে যুগে তো আরোই। পরিবারের মধ্যে সে থাকে অথচ পরিবারের কেউ সে নয়। দাসদাসীরা অবজ্ঞা করে, কোনো কাজ করতে বললে গজগজ করে। আর ছেলেমেয়েরা প্রায়ই এক একটি রত্ন। শার্লটের অভিজ্ঞতা ঠিক তাই। ছেলেদের কিছুতেই বাগে আনতে পারে না। মার কাছে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই। উল্টে তিনি গভর্নেসকেই দোষ দেন। একবার ছেলেরা ঢিল ছুঁড়ে শার্লটের কপাল কেটে দেয়। কর্ত্রী কারণ জিজ্ঞাসা করলে শার্লট বলেন হঠাৎ পড়ে গিয়ে কেটেছে। কর্ত্রী অবশ্য জিজ্ঞাসা করেই খালাস। কিন্তু এমন ব্যবহার ছেলেদের কাছে অপ্রত্যাশিত। সেদিন থেকে শার্লটকে ওরা মানতে আরম্ভ করলো। ছেলেদের মা কিন্তু তাও ভালো চোখে দেখেন না। মাইনে করা গভর্নেসকে ভালোবাসবে কেন

ছেলেরা ? খাবার টেবিলে ছোট বাচ্চাটি একদিন মার সামনেই ওকে বলেছিল, "আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, মিস ব্রন্টি।" মার চোখ কপালে উঠলো। "হায় ভগবান! গভর্নেসকে আবার কেউ ভালোবাসে ?"

প্রায় একই রকম ব্যবহার অ্যানের কপালেও জুটেছিল, কিন্তু অ্যানের মানিয়ে নেবার ক্ষমতা শার্লটের চেয়ে বেশী। তাই অতটা অসহ্য লাগেনি অ্যানের।

গভর্নেসের কাজে ইস্তফা দিয়ে শার্লট বাড়ি ফিরে এল। এমন সময় স্কুলের বন্ধু এলেন নাসি (Nassey) এক চিঠিতে সমুদ্রের ধারে দুজনে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করে পাঠালো। খুশির সীমা রইলো না। সমুদ্র দেখার সৌভাগ্য জীবনে হয়নি। কত সাধ, কত স্বপ্ন সমুদ্রকে ঘিরে। রেলগাড়িতেই কি শার্লট চড়েছেন কোনোদিন ? লীডস (Leeds) যাবার সময় প্রথম রেলগাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা। ট্রেনে যেতে দূর থেকে চোখে পড়ে সমুদ্র। ক্ষীণ দৃষ্টি শার্লট ভালো দেখতে পায় না। তবু সে কি উত্তেজনা! "বোলো না, কিছু বোলো না এখন। আমি নিজে গিয়ে দেখবো ভালো করে।" কাছে গিয়ে একেবারে অভিভূত। মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছে না, চোখে বইছে ধারা। কোনোরকমে এলেনকে বলতে পারলো—"তুমি এগিয়ে যাও। আমি একটু একা থাকি এখানে।" কিছুক্ষণ পরে এলেন সেখানে এসে দেখে শালটের চোখ ফুলে উঠেছে, সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পাঁচ

আরো দু'এক জায়গায় চেষ্টা করে গভর্নেস হবার চেষ্টা ওরা ছেড়ে দিল। বাড়ি ছেড়ে কেউই বেশিদিন কোথাও থাকতে পারে না। শিক্ষকতাই যদি করতে হয় বাড়ি ছাড়বার দরকার কি! এখানে নিজেরাই ছোটখাটো একটা স্কুল খুললে কেমন হয় ? এমিলি আর অ্যানেরও খুব উৎসাহ। কিন্তু পরিকল্পনা কাজে খাটানোর অনেক মুস্কিল। টাকার সংস্থান নেই, স্কুল খোলার মতো বাড়ি নেই। তাছাড়া

স্কুল চালানোর উপযুক্ত বিদ্যাও তো তাদের নেই। গান বাজনা ভালো জানে না, ভাষাজ্ঞানের ডিপ্লোমা নেই। ছাত্রীদের টানবার মতো আর কোনো বিশেষ গুণও নেই। সমস্যার সমাধান মিললো মেরী টেলরের কাছ থেকে। ভাষাশিক্ষার জন্য ব্রাসেল্‌সের কয়েকটি স্কুলের খোঁজ সে দিল। ব্রাসেল্‌সে গিয়ে ভাষাশিক্ষা, সে যে অনেক টাকার ব্যাপার। মিস ব্রানওয়েলকে ধরাধরি করায় তিনি কিছুদিনের জন্য খরচ দিতে রাজি হলেন। খোঁজ খবর করে মঁসিয়ে হেগারের (M. Hegar) স্কুলটিই পছন্দ হলো। সবাই এক সঙ্গে বাড়ি ছাড়লে চলেনা। ঠিক হলো শার্লট আর এমিলি ব্রাসেল্‌সে যাবে। অ্যান বাড়ি থাকবে। ১৮৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবার সঙ্গে ওরা দু'জন ব্রাসেল্‌সে রওনা হলো।

মঃ হেগারের স্কুল ইংলণ্ডের স্কুল থেকে একেবারে অন্যরকম। সতেরো শতকের তৈরি বিরাট বাড়ি, পিছনে বড় বাগান। পঞ্চাশটি ছাত্রছাত্রী আর চারজন শিক্ষক। মাদাম হেগারের সুপরিচালনায় স্কুলটি বেশ ভালো ভাবে চলছিল।

অজানা দেশ, অজানা ভাষা। আলাদা আচার, আচরণ, ধর্ম। এ সব বাধা কাটিয়েও ব্রন্টি-বোনেরা শিক্ষার দিক দিয়ে এত এগিয়ে গেলেন যে অধ্যাপক হেগার পর্যন্ত ওঁদের দিকে নজর দিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে মনের সংযোগ হলেই সত্যিকারের শিক্ষা হয়। অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব মঃ হেগারের। ব্যবহারে খানিকটা শাসন মিশিয়ে তিনি ছাত্রের আবেগ আর অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে চান। আবেগধর্মী মন শার্লটের। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মিললো। এমিলির স্বভাবে কিন্তু শাসন সয় না। সে মানতে পারলো না মঃ হেগারকে। অথচ শার্লটের চাইতে এমিলির মধ্যেই বেশি সম্ভাবনা লক্ষ করেছিলেন মঃ হেগার। বুঝেছিলেন পুরুষ-সুলভ মনের ব্যাপ্তি আর শক্তি এমিলির। কিন্তু চাপা একগুঁয়ে তার স্বভাব, মঃ হেগারের শিক্ষা-প্রণালী তার অপছন্দ। শার্লট কিন্তু মঃ হেগারের প্রিয়পাত্রী হয়ে ইতিমধ্যেই বিদেশী ছাত্রদের ইংরেজী ভাষা শেখানোর ভার পেয়ে গেল।

এরি মধ্যে দুঃখের ছায়া পড়লো। অক্টোবরের প্রথমে মিঃ উইলিয়ম ওয়েটম্যানের মৃত্যু সংবাদ বয়ে চিঠি এল। নভেম্বরের শেষে খবর এল মিস ব্রানওয়েল মারা গিয়েছেন। শার্লট আর এমিলি রওনা হয়ে গেল হাওয়ার্থে।

মিস ব্রানওয়েলের যা কিছু টাকাকড়ি ওদের নামেই দিয়ে গিয়েছেন। স্কুল খোলার দিক থেকে আর অসুবিধে নেই। মঃ হেগার শোকে সহানুভূতি জানিয়ে মিঃ ব্রন্টিকে চিঠি দিলেন। তাতে শার্লট আর এমিলিকে ভাষা শিক্ষা শেষ করবার জন্য আবার পাঠিয়ে দেবার অনুরোধও জানালেন। এমিলি অতদিন বাড়ি ছেড়ে ছিল সেই তার পক্ষে যথেষ্ট। আর সে ব্রাসেল্‌সে ফিরে যেতে রাজি নয়। কাজেই ১৮৪৩ সনের প্রথমে শার্লট একাই গেল সেখানে।

এবার যেন ব্রাসেল্‌সের আবহাওয়া পালটে গেল। এমিলি কাছে নেই। শার্লট এখন অনেক বেশি সচ্ছন্দ, স্বাধীন; শার্লটের মনেরও কোথায় যেন বদল হয়েছে। তিনি এখন পূর্ণ যুবতী। মঃ হেগারের প্রতি তাঁর টান যেন শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্ককে ছাড়াতে চাইছে। এ টান কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে তা তিনি নিজেও জানেন না। মাদাম হেগারও আগের মতো প্রসন্ন নন মনে হয়। কোনো কারণই খুঁজে পান না শার্লট। ভাবেন এ বুঝি নিছক কল্পনা। আবার অস্বীকার করবারও উপায় নেই। ব্যবহারে ভদ্র ঠিকই, কিন্তু আগের মতো বন্ধুত্বের প্রীতি মাদামের মধ্যে নেই।

এর কারণ ধর্ম নিয়ে মতান্তর হলেও হতে পারে। কিন্তু আরো একটি বড় কারণ দেখা যায়। মঃ হেগারের উপর ইংরেজী শিক্ষিকার বড় বেশি টান মাদামের তীক্ষ্ণ নজর এড়ায়নি। শার্লটের প্রায় হিস্টিরিয়া গোছের ভাব তাঁর সইতো না। শার্লট যে ছাত্রী আর শিক্ষকের প্রেম নিয়ে লম্বা লম্বা কবিতাও লিখতেন তা তিনি না দেখলেও ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারতেন। এটা আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করতেন। অবচেতন আর অনুচ্চার ঈর্ষা দুজনের মধ্যেই ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকলো।

স্কুলের লম্বা ছুটির সময় শার্লটের দিন আর কাটে না। ব্যাপারটার মধ্যেকার জটিলতা তখনো তাঁর মাথায় ঢোকেনি। কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল। জীবনের ছন্দে ক্ষণিক আনন্দের সুর যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আবার শার্লটকে অনিদ্রারোগে ধরলো। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন। মাদাম হেগার এ নিয়ে কোনো উৎকণ্ঠা দেখালেন না। শার্লটের আরো মন খারাপ হলো তাতে। মাদাম যেন ওঁকে একেবারেই পছন্দ করতে পারছেন না। মঁসিয়েও মনে হয় স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে ওর দিকে ততটা মনযোগী নন। বিরাট ফাঁকা বাড়ী যেন বুকের উপর চেপে বসে। শার্লট বেরিয়ে পড়েন শহরে। এলোমেলো ঘুরে সন্ধ্যায় ফেরেন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে। কিন্তু রাত্রে ঘুম হয় না, দুঃস্বপ্ন দেখেন; বাড়ির জন্য মন ব্যাকুল হয়, শরীর কাঁপে, অস্বস্তি বোধ হয়।

হেগারকে অনুরাগের চোখে দেখায় আশ্চর্যের কিছু নেই। শার্লটের বয়স ছাব্বিশ। নিরানন্দ সঙ্গীহীন জীবন, মনে আবেগের জোয়ার। মঃ হেগারের মতো জ্ঞানী, গুণী, শক্তিমান পুরুষকেই তো শার্লট কতবার অ্যাংগ্রিয়ার পাতায় এঁকেছেন। সকলকে বশ করবার ক্ষমতা এঁদের। মেয়েরা এঁদের গুণে মুগ্ধ। কুমারী মেয়েদের কল্পনায় এঁরা রামধনু রঙ। এমনি একজনকে পাবেন বলেই তো শার্লট এলেন-নাসির ভাই হেনরী আর হাওয়ার্থ চার্চের সহকারী পাদ্রীর প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁর কল্পিত পুরুষ কি সাধারণ? পৃথিবীকে উপেক্ষা কববার ক্ষমতা তিনি রাখেন। মঃ হেগার যে শুধু চারিত্রিক দৃঢ়তা আর পুরুষত্বের অধিকারী তা নয়, বুদ্ধি ও মননশক্তিতেও তাঁর তুলনা হয় না। স্নেহ-বুভুক্ষু মন এই মনোহরণের কাছে যেন তাঁর আত্মার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। এ ভালোবাসা হঠাৎ একদিনের নয়। মনের তলায় সঙ্গোপনে দিনে দিনে বেড়ে উঠছিল। শার্লট নিজেও সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ভেবেছিলেন এ বুঝি শিক্ষকের প্রতি বিশ্বস্ততা, ভক্তি, অনুরাগ। যখন বাবার অসুখের জন্য হাওয়ার্থে চলে আসতে হলো তখনি বিরহ জ্বালায় তিনি এর স্বরূপ বুঝতে পারলেন।

মঃ হেগারের প্রতি শার্লটের অনুরাগ সম্বন্ধে কেউই বেশি কিছু জানতেন না। মিসেস গাস্কেল শার্লটের জীবনীতে এ প্রশ্নটি সযত্নে এড়াতে চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ আবার এই প্রেম বিষয়ে স্থির নিশ্চয়। তাঁরা বলেন প্রেমের চরম পরিণতির দিকেই শার্লটের লক্ষ্য ছিল। আবার ক্লেমেণ্ট (Clement), শর্টার (Shorter), আর্নেস্ট ডিমনেট (Ernest Dimnet), মে সিনক্লেয়ার (May Sinclair) প্রমুখ একথা একেবারেই অস্বীকার করেছেন।

মিঃ ব্রন্টির চোখে ছানি পড়ায় তিনি অসহায়। অতএব স্কুল খোলার প্রস্তাব আপাতত মুলতুবী রইলো। বাবার জন্যই ব্রাসেল্‌স ছেড়ে বাড়ি আসা। তাঁকে ফেলে আবার ফিরেই বা যাওয়া যায় কী করে! হাওয়ার্থ ছাড়া অন্য কোনো ভালো জায়গায় স্কুল করার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। এখন আর সেকথা ওঠেই না। শার্লটকে মঃ হেগার ফরাসী ভাষা শিক্ষার ডিপ্লোমা দিয়েছিলেন। দূরে যাওয়া যখন সম্ভব নয়, নিজেদের বাড়িতে ছোটখাটো একটা স্কুল খুললে মন্দ কি? শার্লট প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর প্রচেষ্টা সফল হলো না। এতে অ্যান খুব হতাশ; কিন্তু এমিলি মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। শার্লটের এ এক বিরাট পরাজয়। অবসাদ আর ক্লান্তিতে তাঁর মন ভারী। হাওয়ার্থের বাড়ি এখন আরো নিষ্প্রাণ, আরো নিরানন্দ। চারদিক থেকে দেয়ালগুলো এগিয়ে এসে তাঁকে যেন পিষে মারতে চায়। ব্রাসেল্‌সের যত শিক্ষা, যত অভিজ্ঞতা, কিছুই কাজে লাগানো যাবে না। এমনি অখ্যাত, অজ্ঞাত, অকেজো হয়েই কি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যেতে হবে?

১৯১৩ সনের জুলাইতে 'দি টাইমস' (The Times) পত্রিকা মঃ হেগারকে লেখা শার্লটের চারখানা চিঠি বের করে। মঃ হেগার চিঠিগুলো বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিলেন। মাদাম হেগার সেগুলি সেখান থেকে সযত্নে কুড়িয়ে রাখেন। শার্লটের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগবে বলে গয়নার বাক্সে তুলে রেখে দেন। সে সব চিঠির ভাষা আর আবেগের উচ্ছ্বাসে লোকের চমক লাগে।

এরকমটি যেন অপ্রত্যাশিত। আবার নতুন করে শার্লট-চরিত্র সবাইকে অনুধাবন করতে হয়। এবার মঃ হেগারের প্রতি শার্লটের প্রেমবিষয়ে সকলেই একমত হন।

বাস্তবিকপক্ষে ব্রাসেলসের দিনগুলি শার্লটের জীবনে সব চাইতে মধুর ও আবেগময়। সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে শার্লট অজ্ঞ। ভদ্রসমাজের রীতি যে অনুভূতি ও আবেগকে সংযত রাখা, তা তাঁর জানা ছিল না। মনপ্রাণ উজাড় করা ভালোবাসা তাই তিনি জানাতে চেয়েছিলেন চিঠির মাধ্যমে। কিন্তু শার্লটের ভালোবাসার স্থূল ব্যাখ্যা করা অন্যায়। কড়া ন্যায়বিচার যাঁর, পিউরিটান আবহাওয়ায় যিনি মানুষ, একজন বিবাহিতের প্রতি সাধারণ অর্থে প্রেম তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

ভয়াবহ শূন্যতার মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনোমতে দিনগুলো পার হয়। মঃ হেগারের স্মৃতি জ্বলন্ত আগুনের মতো। কাউকে বলাও যায় না, সওয়াও যায় না। মাঝে মাঝেই হেগারকে চিঠি লিখতে লাগলেন শার্লট—আবেগ ও অনুরাগের ছোঁয়া লাগিয়ে, কিন্তু সাবধানে। স্পষ্ট করে'তো জানানো যায় না। কত ভয়, সঙ্কোচ। যদি কিছু মনে করেন, যদি উত্তর না দেন, যদি বকুনি লাগান।

মঃ হেগার বেশ কয়েকটি চিঠির জবাব দিয়েছিলেন। সেগুলি সংযত, উপদেশপূর্ণ। শার্লটের ভবিষ্যৎ, পড়াশুনা, ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে। ক্রমশ চিঠি কমে এল। বেদনার সঙ্গে শার্লট বুঝতে পারলেন ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা শুধু তাঁর একার, এবং একা তাঁকেই বইতে হবে এই যন্ত্রণা।

হাওয়ার্থের বাড়িও তেমনি চুপচাপ, প্রাণহীন। সেখানে দুঃখ বেদনা ভুলে থাকবার মতো কিছু নেই। এমিলি আর অ্যানের তবু রয়েছে গোণ্ডালের রাজ্য। সেখানে ওদের সান্ত্বনা মেলে। কিন্তু শার্লট। হাওয়ার্থ যেন জীবন্ত কবর তাঁর কাছে। বাইরে বেরিয়ে কাজ করবার, বিচিত্র জীবনকে জানবার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। কঠিন ভাগ্য আবার তাঁদের টেনে আনলো হাওয়ার্থের সঙ্কীর্ণ সীমানায়। পাপাবার আর

কোনো পথ নেই। রাত্রে সবাই শুয়ে পড়লে বোনেরা চুপচাপ বসে ভাবেন তাঁদের নিয়তি। অ্যানের বয়স পঁচিশ, এমিলির সাতাশ, শার্লটের প্রায় তিরিশ—কিন্তু কী ওঁরা করলেন জীবনে? কিছুই না।

ছয়

কিন্তু সাহস, নিষ্ঠা আর আগ্রহ সব বাধাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। একদিকে ব্যর্থ হলেও আরেকদিকে সার্থকতার পথ খুলে যায়। হঠাৎ একদিন এমিলির লেখা একটি কবিতা শার্লটের হাতে পড়ে। ইদানীং মেয়েরা কেউ কাউকে তাদের লেখা দেখাতো না। এমিলিই বেশি সতর্ক। তার লেখা ড্রয়ারে চাবি দেওয়া থাকে। শার্লট অবাক। এমন কবিতা এমিলি লিখেছে? বলিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ছাড়াও অদ্ভুত তার সুর। ঝড়ের মতো, বিষাদের মতো, বন্য উদ্দামতার এক নতুন ছন্দ। মাটির পৃথিবী থেকে মনকে যেন উঁচুতে তুলে ধরে। এমন কবিতা লোকে জানবে না? বাক্সবন্দী হয়ে পড়ে থাকবে? কবিতা ছাপানোর চিন্তা শার্লটের মাথায় এল। এমিলি তো এদিকে চটে আগুন। না বলে তার কবিতা কেন পড়লেন শার্লট? অনেক কষ্টে তাকে শান্ত করে শার্লট বোঝাতে বসলেন। বরাবরই বোনদের ছিল লেখক হবার সখ। এবার যেন সেটা আরো জোরদার হয়ে উঠলো। শার্লট ভাবতে বসলেন। তিনবোনের লেখা কবিতা দিয়ে একটা বই বার করলে কেমন হয়? নিজের কবিতা ছাপানোর যোগ্য কিনা সে সম্বন্ধে শার্লট কোনোদিন ভাবেন নি। কিন্তু এমিলির কবিতা যে ওদের চাইতে একেবারে অন্যরকম সেটা একবার পড়েই বুঝেছিলেন। এমিলি কিছুতেই রাজি হয় না। শার্লটও নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত জয় হলো শালটেরই। এমিলি লেখক হবার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। আবার যখন শুনলেন ছদ্মনামে ছাপা হবে, তখন রাজি না হবার কোনো কারণ রইলো না। ঠিক হলো শার্লটের ছদ্মনাম হবে 'কুরার বেল' (Currer Bell), এমিলির 'এলিস বেল' (Ellis Bell), আর অ্যানের 'অ্যাকটন বেল' (Acton Bell)।

বই ছাপতে হলে কি করতে হয় কোনো ধারণা নে। বিভিন্ন প্রকাশকদের কাছে চিঠি লিখতে আর পাণ্ডুলিপি নিয়ে ধর্না দিতে লাগলেন শার্লট। সব জায়গা থেকেই প্রায় নিরাশ হতে হলো। শেষে অ্যালিয়ট এণ্ড জোনস (Alyott & Jones) কোম্পানী ছাপতে রাজি হল।

খুবই গোপন ব্যাপার। কাউকে জানানো হবে না।' এমনকি প্রাণের বন্ধু এলেনকেও নয়। গোপনে প্রুফ দেখার মধ্যে কী উত্তেজনা তিনবোনের। এরি মধ্যে আবো পরিকল্পনা। গল্পের বই ছাপলেও তো হয়? অমনি উৎসাহের সংগে লেখা আরম্ভ হয়ে গেল। শার্লট লিখলেন 'দি প্রফেসর' (The Professor), অ্যান 'অ্যাগনেস গ্রে' (Agnes gray) আর এমিলি তার আশ্চর্য উপন্যাস 'উয়েদারিং হাইটস' (Wuthering heights)।

কবিতার বই ছাপা হয়ে বেরোলো। কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় সমালোচনার জন্য বই দেওয়া হলো, কিন্তু দু'একটির বেশি সমালোচনা বেরোলো না। যে কটি বেরোলো তাও দায়সারাগোছের সমালোচনা। বই বিক্রি হলো মাত্র দু কপি। প্রথম প্রয়াসেই ব্যর্থতা। ওঁরা নিরাশ হলেন, কিন্তু দমে গেলেন না। কবিতার পরিবর্তে উপন্যাসের দিকে বেশি করে মন দিলেন। 'দি প্রফেসর' লেখা শেষ হলে শার্লট প্রকাশকদের কাছে পাণ্ডুলিপি পাঠাতে লাগলেন। উপন্যাসটি লিখে নিজে তিনি খুব সন্তুষ্ট নন। একেবারেই পরীক্ষামূলক লেখা। উচ্ছ্বাস কল্পনা আর আবেগ সংযত করার সযত্ন প্রয়াস রয়েছে এটিতে। গত ক'এক বছরের অভিজ্ঞতা শার্লটকে শিখিয়েছে অনেক কিছু। বুঝেছেন দিবাস্বপ্নের মোহ জীবনে শুধু অশুভই আনে। তাই এবার রোমান্সকে দূরে রেখে, আবেগকে সংযত করেছেন। কিন্তু এ করতে গিয়ে উপন্যাসটি যা দাঁড়ালো কেউই তা পছন্দ করতে পারলো না। প্রকাশকরা পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। কাব্যগ্রন্থের চাইতেও উপন্যাসটির অসাফল্যে শার্লটের মনে বেশি আঘাত লাগলো।

মিঃ ব্রন্টির চোখের ছানি অপারেশনের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ম্যাঞ্চেষ্টারে। বাবার দেখাশুনা আর কাজকর্মের ফাঁকে শার্লট শুরু করে দিলেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'জেন আয়ার' (Jane Eyre)। কিছুদিন ধরেই প্লটটা তিনি মনে মনে ভাবছিলেন। এবার কল্পনার ভাণ্ডারে আগল নেই। বাইরের জগৎকে যেন ভুলে গেলেন শার্লট। আবেগ ও কল্পনা উজাড় করে 'জেন আয়ার' শেষ করার দিকে মন দিলেন। একমাস ম্যাঞ্চেষ্টারে কাটিয়ে হাওয়ার্থে যখন ফিরলেন, সঙ্গে তাঁর এক বোঝা পাণ্ডুলিপি।

মিঃ ব্রন্টি আরোগ্যের পথে। তবু সব সময় সযত্ন সতর্কতার দরকার। লেখার সময় মেলে না। সারাদিন পর রাত্রে বাবা ঘুমানোর পর যে সময়টুকু পাওয়া যায় তাতেই লেখা এগিয়ে চলে। একদিকে নতুন সৃষ্টির আনন্দ, আরেকদিকে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা। আশা নেই, ভরসা নেই; অন্ধকার, শূন্য জীবন। যৌবন মিলিয়ে যায় স্বপ্নের মতো। কী করলেন শার্লট এই তিরিশ বছরের জীবনে? কী পেলেন? বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার প্রবল ইচ্ছে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাবার অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ে। সে ইচ্ছে সংযত করতে হয়।

১৮৪৬ সনের দুরন্ত শীত। সকলেরি অসুখ বিসুখ। বিশেষ করে অ্যান বারবার অসুখে পড়তে লাগলো। রোগা, দুর্বল, ফ্যাকাশে মুখ চোখ। সকলেরই দুর্ভাবনা তার জন্য।

ইতিমধ্যে 'জেন আয়ার' প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার ছাপানোর জন্য প্রকাশক খুঁজে বার করার পালা। মেসার্স স্মিথ এণ্ড এলডার (Messers Smith and Alder) থেকে এক চিঠি এল যে কুরার বেলের (Currer Bell) আর কোনো লেখা থাকলে তাঁরা ছাপতে রাজি আছেন। আশাতীত প্রস্তাব। শার্লট সংগে সংগে 'জেন আয়ার' শেষ করে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর শুরু হলো উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা। এমিলির 'Wuthering heights' আর অ্যানের 'Agnes gray' আগেই প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরছিল। হঠাৎ সকলেরই

যেন একসঙ্গে কপাল খুলে গেল। চিঠি এল টি. সি. নিউবী (T. C. Newby) রাজি আছেন উপন্যাস ছুটি ছাপতে।

'জেন আয়ার' সম্বন্ধে প্রকাশকদের প্রথম থেকেই কোনো সংশয় ছিল না। মিঃ উইলিয়মসের (Mr. W. S. Williams) হাতে পাণ্ডুলিপিটি প্রথম আসে। তিনি পড়ে মুগ্ধ হন। প্রকাশনীর কর্তা জর্জ স্মিথকে (George Smith) পড়ে দেখতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। জর্জ স্মিথ রবিবার সকালে পড়া শুরু করলেন। এক নাগাদে বারোটা পর্যন্ত পড়া চললো। বারোটায় এক বন্ধুর সংগে বেরোনোর কথা। বন্ধু হাজির যথাসময়ে। জর্জ স্মিথের তখন হাত থেকে বই নামানোর অবসর নেই। কোনোরকমে ছুলাইন লিখে দিলেন "বড় ব্যস্ত, এখন বেরোনো অসম্ভব।" ভৃত্য এসে জানালো খাবার তৈরী। বললেন "স্যাণ্ডউইচ আর কিছু পানীয় রেখে দাও।" বই পড়া চলতেই থাকলো। রাত্রের খাওয়া যেমন তেমন করে সেরে বইটি শেষ করে তবে শুতে গেলেন।

একমাসের মধ্যেই প্রুফের প্রথম বাণ্ডিল এল। এমিলি আর অ্যানের বই তখনো নিউবীর অফিসে পড়ে আছে। দেড়মাসের মধ্যে 'জেন আয়ার' ছাপা হয়ে বেরোলো। এতবড় একটা কৃতিত্বের কথা। কিন্তু হাওয়ার্থ গ্রামের কেউ জানলোনা।

সাড়া পড়লো লণ্ডনে। বিখ্যাত উপন্যাসিক থ্যাকারে মিঃ উইলিয়মস্‌কে জানালেন তাঁর পুরো একটা দিন নষ্ট হয়েছে 'জেন আয়ার' পড়ে। থ্যাকারে ধারণা করছিলেন এ নিশ্চয়ই কোনো মহিলার লেখা। লিখলেন, "কার লেখা আমি তা বলতে পারবোনা, তবে কোনো মহিলা যদি সত্যিই লিখে থাকেন, অন্য অনেক লেখিকার চাইতে ভাষার উপর তাঁর দখল বেশি। আমার মনে হয় এটা নিশ্চয় কোনো মহিলার লেখা। কিন্তু কে তিনি? তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই। ইংরেজি উপন্যাসের মধ্যে একমাত্র এঁর লেখাই আমি দীর্ঘকাল পরে পড়তে পারলাম।"

সকলের মুখে মুখে 'জেন আয়ার'। বই কিনতে দোকানে অগুনতি

ভিড়। লেখক সম্বন্ধে নানা গুজব ও আলোচনা। জীবনে সার্থকতার খোঁজ বুঝি এতদিনে মিললো। শার্লটের মনে খুশির দীপ্তি। 'জেন আয়ার' তাঁরই প্রতিরূপ, দুঃখের গৌরবেই তার মহিমা।

জেন আয়ার শৈশবেই মা আর বাবাকে হারিয়েছে। মাসী মিসেস রিডের (Mrs. Read) দুর্ব্যবহার সহ্য করে তার দিন কাটে। কটূক্তি আর নিষ্ঠুরতা সীমা ছাড়ালে জেন একদিন সরব বিদ্রোহ জানায়। শাস্তি হিসেবে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় লো উড (Low Wood School) স্কুলে। সেখানেও চরম দুর্দশা। তবু লেখাপড়ার দিকে আগ্রহ থাকায় সব কষ্ট সয়ে তার দিন কাটে। স্কুলের পড়া শেষ করে থর্নফিল্ডে (Thornfield) মিঃ রচেষ্টারের (Mr. Rochester) বাড়িতে গভর্নেস হয়ে যায় জেন। মিঃ রচেষ্টার গুরু গম্ভীর, রগচটা গোছের লোক। তার অবৈধ মেয়ে অ্যাডেল (Ade´le) জেনের ছাত্রী। জেনের বুদ্ধি আর সাহসের পরিচয়ে ক্রমশঃ মিঃ রচেষ্টার তার দিকে আকৃষ্ট হন। জেন ও তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করে। বিয়ের সব ঠিক। শেষ মুহূর্তে প্রকাশ পায় মিঃ রচেষ্টারের স্ত্রী জীবিত, মাথা খারাপ বলে তাকে বাড়িতেই আটকে রাখা হয়েছে। লজ্জায়, দুঃখে জেন থর্নফিল্ড থেকে পালায়। বন প্রান্তর পেরিয়ে সে যখন ক্লান্তির শেষ সীমায়, দেখা হয় রেভারেণ্ড সেন্ট, জন রিভার্স (Rev. St. John Rivers) ও তাঁর বোনদের সঙ্গে। ওঁরা সেবা শুশ্রূষায় জেনকে চাঙ্গা করে তোলেন। কিছুদিন পর জন রিভার্স জেনকে বিয়ে কবতে চান। জন রিভার্সের প্রবল ব্যক্তিত্বে জেন মুগ্ধ। কিন্তু মিঃ রচেষ্টারের কাছে তাঁর মন বাঁধা। এ বিয়েতে মন সায় দেয় না। তবু অনিচ্ছা-সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রাজি হতে হলো। এমনি সময়ে একদিন রাত্রে জেনের মনে হলো মিঃ রচেষ্টার যেন কাতরভাবে তাকে ডাকছেন। কোথায় থর্নফিল্ড আর কোথায় জন রিভার্সের বাড়ি। তবু জেন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই রচেষ্টারের কোনো বিপদ। যে করেই হোক থর্নফিল্ড তাকে যেতেই হবে। জেন থর্নফিল্ডে পৌঁছে দেখে বাড়িতে আগুন লেগে রচেষ্টারের স্ত্রী মারা গিয়েছেন। স্ত্রীকে বাঁচাবার চেষ্টা

করতে গিয়ে রচেষ্টারেরও বহু জায়গা আগুনে পোড়া ও চোখ দুটো অন্ধ। দুর্ভাগা রচেষ্টারের পাশে জেন তখন প্রেম ও করুণার ডালি নিয়ে দাঁড়ায়। রচেষ্টারকে বিয়ে করে তাঁকে সুখী করাই তার জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে।

জেন আয়ারের মধ্যে শার্লট নিজেকেই দেখতে চেয়েছিলেন। লো উড স্কুলের বর্ণনা হুবহু কোয়ানব্রীজ স্কুলের মতো। জেনের বন্ধু হেলেনের করুণ মৃত্যুর কথা মনে পড়িয়ে দেয় মারিয়াকে। মিঃ রচেষ্টারের বিরাট ব্যক্তিত্ব, স্বভাবের কাঠিন্য ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় মঃ হেগারের, কিন্তু কল্পনার রঙে ঘটেছে সবারই রূপান্তর। যে কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছিল জামোরনা আর নর্দাংগারল্যাণ্ড সেই কল্পনার রঙ জেন আয়ারের সর্বত্র ছড়ানো। তাই শুধুমাত্র বাস্তব না হয়ে জেন আয়ার সর্বজনীন সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

'জেন আয়াবে'র প্রশংসা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমন সুখবর কি আর বাবাকে লুকিয়ে রাখা যায়।

একদিন বিকেলে মিঃ ব্রণ্টি পড়বার ঘরে বসে আছেন। বাবাকে একা পেয়ে শার্লট সেখানে এলেন। হাতে একখানা 'জেন আয়ার'। আর দু-একটা সমালোচনার কপি।

—"বাবা, জানো আমি বই লিখেছি।"

—"তাই নাকি ?"

—"হ্যাঁ বাবা। তুমি পড়ে দেখবে ?"

—"আমাব যে দেখতে কষ্ট হবে।"

—"হাতে লেখা নয় বাবা, ছাপা হয়ে বেরিয়েছে।"

—"কী সর্বনাশ! খরচের কথা একটুও ভাবলে না? ক্ষতি তো হবেই। বই বিক্রি হবে কি করে? তোমাকে কেউ জানে না। নামও শোনেনি কোনোদিন।"

—"না বাবা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। তোমাকে যদি দু একটা সমালোচনা পড়ে শোনাই আর এবিষয়ে আরো কিছু বলি তবে তোমারও মনে হবে না।"

সমালোচনা পড়ে শোনাবার পর বইটা বাবাকে দিয়ে শার্লট চলে এলেন। চায়ের সময় বাবা বোইকে বললেন—"জানো শার্লট বই লিখেছে? আর সত্যি সত্যি ভালো বই।" সেদিন থেকে শার্লটের কৃতিত্বের গর্বই মিঃ ব্রন্টির একমাত্র সান্ত্বনা। সব সন্তানই তাঁর প্রতিভাশালী কিন্তু সাফল্য লাভ হলো একমাত্র শার্লটেরই। শার্লটের লেখা সম্বন্ধে যে যেখানে প্রশংসা করেছে তিনি জড়ো করতে লাগলেন।

সাত

সংসারের হাজারো দাবি মিটিয়ে লেখার সময় থাকে না। তবু তারি মধ্যে প্রাণপণ প্রয়াস। মিঃ উইলিয়মসের সঙ্গে চিঠিতে অনেক আলাপ আলোচনা হয় লেখা নিয়ে। থ্যাকারে, জর্জ লিউয়েস, লী হাণ্ট ইত্যাদি সাহিত্যিকদেব সঙ্গেও চলে চিঠির ,আদানপ্রদান। ছোট্ট গম্ভীর জীবনে এ যেন মুক্তির আস্বাদ। মিঃ লিউয়েস শার্লটের অতি-কল্পনা পছন্দ করতে পারেন নি। আরো একটু রাশ টানতে উপদেশ দিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। আদর্শ হিসাবে দেখিয়েছিলেন জেন অষ্টেনকে। শার্লটের এ উপদেশ ভালো লাগেনি। কল্পনা আর আবেগে ভরপুর কাব্যিক মন তার। তাই স্বভাবতই জেন অষ্টেনের প্রতিভা আর ক্লাসিক রীতিকে তাঁর ঠিক মনে ধরে নি।

'জেন আয়ারের আশাতীত সাফল্য শার্লটের মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিল। ১৮৪৮ সালে উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ হবার সময় থ্যাকারের নামে উৎসর্গ পত্র ছাপা হলো। থ্যাকারেকে শার্লট কোনোদিন না দেখলেও সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়। অবশ্য থ্যাকারে 'জেন আয়ারে'র প্রশংসা করেছিলেন বলেই বইটি উৎসর্গ করতে তাঁর সাহস হয়েছিল। এতে কিন্তু এক মুস্কিল হলো। থ্যাকারের স্ত্রীর মাথা খারাপ হওয়ায় কয়েক বছর ধরে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল। তাই থ্যাকারের সঙ্গে মিঃ রচেষ্টারের মিল খুঁজে নানা গুজবের সৃষ্টি হতে লাগলো। 'কুরার বেল'কে লোকে থ্যাকারের গভর্নেস বানিয়ে ছাড়লো। শার্লটের পক্ষে মহালজ্জার ব্যাপার। তিনি ভয় পেলেন

পাছে থ্যাকারে মনে করেন তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা জেনে শুনেই তিনি উপন্যাসটি লিখেছেন। থ্যাকারে অবশ্য চিঠিতে এই আশঙ্কা দূর করেছিলেন।

দীর্ঘদিনের বিরক্তিকর অপেক্ষার পর 'অ্যাগনেস গ্রে' সম্বন্ধে দু একজন সামান্য প্রশংসাসূচক মন্তব্য করলেন। 'উয়েদ্যারিং হাইটস্' সম্বন্ধে তাও না। তখনকার পাঠক সমাজ বইটি একেবারেই পছন্দ করেনি। পরবর্তী কালের বিচারে 'উয়েদ্যারিং হাইটস্' এর নূতন মূল্যায়ন হয়েছে। স্বীকৃতি পেয়েছে এমিলি ব্রন্টির অপূর্ব সৃষ্টি বলে। কিন্তু এমিলি বেঁচে থাকতে সে কথা কেউ বলেনি। যুগের সঙ্গে এমিলির মেজাজের একেবারেই মিল ছিল না। তাই তার রূঢ়তাকে লোকে নিন্দে করেছে। ভাষার সহজ লালিত্যও কারো চোখে পড়ে নি। এমনকি শার্লট, যাঁর এমিলির ক্ষমতা ও প্রতিভা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল না, তিনিও ভেবেছিলেন 'উয়েদ্যারিং হাইটস্' ছাপা না হলেই যেন ভাল হতো। এমিলিকে ভালোবাসলেও তার আত্মিক রহস্যের দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেদ করে তাকানো শার্লটের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমিলি সম্বন্ধে অনেক ধারণা তার এই রহস্যময়তার জন্য প্রচারিত আছে। সমাজ থেকে লোকালয় থেকে অনেক দূরে বিজন প্রান্তরের বাসিন্দা এমিলি। সে যেন দেশ কালের অতীত, অনন্তের পথ সন্ধানী। কিন্তু এ বিচার এমিলির পক্ষে প্রযোজ্য নয় এমিলি কল্পলোকে বাস করলেও বাস্তব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়।

'উয়েদ্যারিং হাইটস্' ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডেরই কাহিনী। চরিত্রগুলি স্বপ্নরাজ্যের নয় ইয়র্কশায়ারের। হীথক্লিফ দুঃসাহসিক অভিযানের নায়ক নয়, জন্ম তার লিভারপুলের বস্তি এলাকা। উপন্যাসের চরিত্রদের মুখের ভাষা ইয়র্কশায়ারেরই ভাষা।

বিষাদ করুণ, অদ্ভুত কল্পনামূলক উপন্যাসটির মূল চরিত্র হীথক্লিফ (Heathcliff)। মিঃ আর্নশ (Mr. Earnshaw) লিভারপুলের রাস্তায় তাকে কুড়িয়ে পেয়ে বাড়িতে এনে ছেলের আদরে মানুষ করেছিলেন। আর্নশর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে হীণ্ডলে (Hindley)

হীথক্লিফের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। আর্নশ'র মেয়ে ক্যাথারিনকে (Catherine) হীথক্লিফ ভালোবাসে। তার ভাবপ্রবণ উদ্দাম প্রকৃতি ক্যাথারিনের মধ্যে যোগ্য দোসর খুঁজে পায়। ক্যাথারিন হীথক্লিফকে ভালবাসলেও বিয়ে করতে রাজি নয়। অশিক্ষিত, অখ্যাত হীথক্লিফকে বিয়ে করলে তার মর্যাদার হানি হবে ক্যাথারিনের মুখের এই কথা হীথক্লিফ আড়াল থেকে শুনতে পায়। মনে তার আঘাত লাগে। কাউকে না জানিয়ে সে বাড়ি থেকে চলে যায়। তিন বছর প্রচুর টাকাকড়ি উপায় করে ফিরে এসে দেখে অনেক বদল হয়েছে। ক্যাথারিনের বিয়ে হয়েছে এডগার লিণ্টনের (Edgar Linton) সঙ্গে। হীণ্ডলে জুয়া খেলতে শুরু করেছে। স্বভাবে হয়েছে আরো অমার্জিত। ইতিমধ্যে সে বিয়েও করেছে। হীথক্লিফ বড়লোক হওয়ায় হীণ্ডলের উপর, পরিবারের সকলের উপরে তার স্থান। তার সর্বগ্রাসী ভালোবাসার আগুনে ক্যাথারিন তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে জীবনশক্তি হারিয়ে ফেলে। কন্যা ক্যাথিকে (Cathy) জন্ম দিয়ে সে মারা যায়। হীথক্লিফ তখন আরও মরিয়া হয়ে এডগারের বোন ইসাবেলাকে প্রলুব্ধ করে। ইসাবেলাকে সে ভালোবাসে না। শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেবার জন্য বিয়ে করে ইসাবেলার উপর অমানুষিক নিষ্ঠুরতা দেখায়। ক্রমশ হীণ্ডলে আর তার ছেলে হেয়ারটনকে (Hareton) সম্পূর্ণ নিজের অধীনে আনে হীথক্লিফ। তার উপর অত্যাচারের কথা মনে রেখে সে হেয়ারটনের উপর অত্যাচার চালায়, ক্যাথি বড় হলে ক্যাথিকে ভুলিয়ে সে নিজের অপদার্থ, রুগ্ন ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়। কারণ লিণ্টনের সম্পত্তির উপর তার নজর।

হীথক্লিফের ছেলে মারা গেলে ক্যাথি আর হেয়ারটনের মধ্যে প্রণয় জন্মে। ক্যাথি তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলে। হীথক্লিফের প্রতিশোধের আগুন তখন প্রায় নিভে এসেছে। কিন্তু অনির্বাণ শিখা ক্যাথারিনের প্রতি তার প্রেম। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাই তার এখন ক্যাথারিনের সঙ্গে অনন্ত মিলনের আকাঙ্ক্ষা। লিণ্টন আর আর্নশর বাড়ি ধ্বংস করবার চক্রান্ত তার ব্যর্থ হয়।

হীথক্লিফের মৃত্যুর পর ক্যাথি আর হেয়ারটনের মিলন ঘটে। সে যুগের পাঠকদের কাছে হীথক্লিফ একজন বিকৃতমনা, বীভৎস চরিত্রের লোক। ইসাবেলা, হেয়ারটন, ক্যাথি, তার নিজের ছেলে এমনকি হীণ্ডলের প্রতি সে যে নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে তাতে স্বাভাবিক মানুষ বলে তাকে কেউ মনে করতে পারেনি। কিন্তু এমিলির অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে পরিচিত হলে দেখা যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই আমাদের সহানুভূতি হীথক্লিফের দিকে চলে গেছে। প্রতিশোধের স্পৃহা তার অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি থেকে আসতে পারে ; কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে কার্য-কারণ সম্বন্ধ। হীথক্লিফ অমানুষ, কিন্তু তার অমানুষিকতার কারণ আমরা বুঝি। তার কাজকে আমরা সমর্থন করি না, প্রশংসা করি না। কিন্তু তার মূলে যে গম্ভীর আর জটিল তথ্য রয়েছে তা আমরা ভুলতে পারি না। হীথক্লিফ তাই হয়ে দাঁড়ায় এক বিরাট শক্তির আধার। ক্যাথারিন আর হীথক্লিফ যেন দুটি নদী পরস্পরের দিকে ছুটে চলেছিল। মাঝপথে গতি গেল বদলে। ফলে দুর্বার আক্রোশে সব বাধা ঠেলে এগিয়ে যেতে চাইলো হীথক্লিফ।

ক্যাথারিনকে আমরা প্রথম দেখি অশরীরী আত্মারূপে। উয়েদারিং হাইটস-এ মৃত্যুর অর্থ আত্মার মুক্তি, একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া নয়। তাই মৃত ও জীবিত এখানে পাশাপাশি বাস করে। তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হয়। স্টিভেনসন বা জেমসের মতো এমিলির উপন্যাস তাই প্রাকৃতিক নয়। তার বাস্তব আধ্যাত্মিক লোকের বাস্তব। প্রাকৃতিক আর অতিপ্রাকৃতিকের মধ্যে সেখানে তফাৎ নেই।

হীথক্লিফের মনের বদলের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসটির সুরেরও বদল হয়েছে। ক্যাথি আর হেয়ারটনের ভালোবাসায় হীথক্লিফের প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। হেয়ারটনকে ক্যাথি যখন লিখতে শেখাচ্ছে, অথবা তার অজ্ঞতা নিয়ে অন্যের মতো বিদ্রূপ করছে না, তখনি তার মধ্যে রূপ নিয়েছে ক্যাথারিন আর্নশ।

ক্যাথি আর হেয়ারটন ক্যাথারিন ও হীথক্লিফের হুবহু প্রতিরূপ নয়। কিন্তু তারা মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা ও নিরবচ্ছিন্ন ধারার

প্রতীক। ওদের দিকে তাকিয়ে হীথক্লিফ বোঝে তার জয়ের মধ্যে রয়েছে কতোখানি ফাঁকি। ক্যাথারিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কিছু আভাস সে খুঁজে পায় ক্যাথি আর হেয়ারটনের মধ্যে।

এমিলি সম্বন্ধে প্রচুর তত্ত্ব খাড়া হয়েছে। কেউ কেউ তাকে অবিশ্বাস্যভাবে বড় করে দেখেছেন। কিন্তু কোনো লেখকই তাকে অনুকরণ করেননি। ঠিক এমিলির মতো কবিতা বা উপন্যাস আর কেউ লেখেননি। এমিলির লেখার উপকরণ এসেছে তার একান্ত গভীর উপলব্ধি থেকে! এই অনুভূতি সাধারণের ধারণার বাইরে। কেন যে সে এভাবে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল বাইরের জগৎ থেকে, কেউ জানে না। হয়তো ছেলেবেলায় ছিল স্নেহের অভাব, অযোগ্যতাবোধ, বা তাকে কেউ ভালোবাসবেনা এই আশঙ্কা। তাই সে আশ্রয় নিয়েছিল কল্পলোকের নির্জনতায়। সে রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বরী এমিলি নিজে। সেখানে কোনো ব্যর্থতা নেই, হতাশা নেই, ভালোবাসা না পাওয়ার বেদনা নেই। সেখানে সব দাবি, সব কামনা তার পূর্ণ। এই গূঢ় ধ্যানোপলব্ধিই তার কবিতা আর উপন্যাসের উৎস।

নয়

অ্যানের উপন্যাস 'দ্য টেনাণ্ট অব ওয়াইল্ডফিল্ড' (The Tenant of Wildfield) ১৮৪৮ সালে শেষ হলো। টি. সি. নিউবী (T. C. Newby) ছাপানোর ভার নিলেন। এ উপন্যাসটিরও প্রশংসা হলো না। সবাই বলতে লাগলো : এটিও কুরার বেলের লেখা ; কুরার বেল, এলিস বেল, অ্যাকটন বেল আসলে একজনেরই নাম ; অন্য উপন্যাসগুলি তাঁর 'জেন আয়ারের' আগের লেখা ইত্যাদি। অবস্থা চরমে পৌঁছলো যখন আরেকটি আমেরিকান প্রকাশক কুরার বেলের উপন্যাসের বিজ্ঞাপন দিলেন। 'জেন আয়ারের' প্রকাশকই কুরার বেলের অন্য উপন্যাসের জন্য চুক্তিবদ্ধ। ওঁরা স্মিথ অ্যাণ্ড অ্যালডারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন। হাওয়ার্থে খবর পৌঁছল। এতদিন

ছদ্মনামেই বেশ চলছিল। এখন সেটা বজায় রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। আর যাই হোক, প্রতারণার অভিযোগ সওয়া যায় না।

শার্লট আর অ্যান তাড়াহুড়ো করে রাত্রির ট্রেনে লণ্ডন রওনা হলেন। এমিলি রইলো। তার কোথাও যাওয়া ভালো লাগেনা। পরদিন সকালে স্মিথ অ্যাণ্ড অ্যালডার কোম্পানীর অফিসে দুজনে হানা দিলেন। ছোটখাটো দেখতে, লাজুক আর আনাড়ি ধরনের সাদাসিদে পোষাক পরা দুটি মেয়ে। জর্জ স্মিথকে যখন শার্লট তাঁর নিজের নাম বলে কুরার বেলকে লেখা চিঠি বার করে টেবিলের উপর রাখলেন তখন সে এক মজার ব্যাপার। কুরার বেলের রহস্য এবার ভেদ হলো। তারপর কয়েকদিন ধরে লণ্ডনে কখনো অপেরা, কখনো ডিনার পার্টি, চায়ের নিমন্ত্রণ; কখনো বা একাডেমি আর ন্যাশনাল গ্যালারি। একগাদা বই উপহার নিয়ে ওঁরা বাড়ি ফিরলেন। সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেশা শার্লটের পক্ষে দিগ্বিজয়। তাঁর স্বপ্ন যেন এতদিনে সার্থক হলো।

'জেন আয়ার' প্রকাশের পর মিঃ উইলিয়ম আরেকটি উপন্যাসের জন্য শার্লটকে তাগাদা দিচ্ছিলেন। প্রথমটা শার্লট ইতস্তত করছিলেন। তাঁর তো জীবনের অভিজ্ঞতা নেই। উপকরণ তিনি পাবেন কোথায়? 'প্রফেসর' উপন্যাসটি আরেকবার ভালো করে লিখে ছাপানোর প্রস্তাবে ওঁরা রাজি নন। কিন্তু শার্লট এবার নিজে ভালো করে না জেনে কিছু লিখবেন না।

একঘেয়ে, নিঃসঙ্গ, দুঃখের জীবনে সাফল্যের আশার আলো দেখা দিতে না দিতেই এল দুর্যোগ। ব্রানওয়েল খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লো। একমাত্র ছেলে বাড়ির। যতই নিরাশ করুক, বিপথে যাক, তার জন্য অন্তহীন দুর্ভাবনা থাকেই। ডাক্তার, ওষুধ, সেবাশুশ্রূষা কিছুরই ত্রুটি হলো না। কিন্তু দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ সারানো ডাক্তারের সাধ্যাতীত। ব্রানওয়েলের মৃত্যুতে মিঃ ব্রন্টি শোকে অধীর হয়ে পড়লেন। কিন্তু আরো দুঃখ, আরো আঘাত যে তখনো বাকি! এবার এমিলি। এমিলির শুকনো কাশি, জ্বর, অনিদ্রা আর খাওয়ায় অরুচি। সে খুবই অসুস্থ, দুর্বল। শার্লট আর অ্যান মহা দুর্ভাবনায় পড়লেন।

শার্লটের নিজের শরীরও সুস্থ যাচ্ছিল না। ব্রানওয়েলের শোক, এমিলিকে নিয়ে আবার দুশ্চিন্তা। শরীর মন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। নতুন আরম্ভ করা উপন্যাস 'শার্লি' (Shirley) অমনিই পড়ে রইলো। হাত দিতে ইচ্ছে হলো না, সময়ও নেই।

দিনের পর দিন এমিলি শুকিয়ে যাচ্ছে। মুখ চোখ ফ্যাকাশে, তার জন্য কিছু করাও মুস্কিল। কোনো কথার জবাব দেয় না। কষ্ট-লাঘবের জন্য কিছু করতে গেলে আপত্তি জানায়। অসুখকে উপেক্ষা করেই যেন সে তার সঙ্গে লড়াই করবে। সাহায্যের কথা বললে ভীষণ চটে যায়। ওষুধ দেখলে বিরক্ত হয়। কী করা যায় এমন মেয়েকে নিয়ে? শার্লটের খুব মন খারাপ লাগে। এমিলিই যদি না বাঁচে তবে জীবনে আর রইলো কী? এমিলি যা আরম্ভ করেছে তাতে আর বেশি দিন নয়। কোনো কাজেই তো এমিলির কোনোদিন দেরি হয় নি। চলে যেতেও দেরি হবে না। সত্যিই তাই, অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যেতে লাগলো। যেন সবাইকে ছেড়ে যাবার জন্য এমিলি খুবই ব্যগ্র।* শরীরের জোর যত কমছে, মনের জোর, জেদ ততই বাড়ছে। নিজেকেও যেন সে ভালোবাসে না, নির্মম, উদাসীন। এমনটি আর কে কোথায় দেখেছে।

এরই মধ্যে স্মিথ অ্যাণ্ড অ্যাডিলার কোম্পানী ওদের কবিতার বই আবার বার করলো। শালটের কবিতা এবার একেবারে বাদ। শার্লট একটুও অবাক বা ক্ষুণ্ণ হলেন না তাতে। শুধু অবাক হলেন কবিতার বইটি কোথাও প্রশংসা পেল না বলে। ওরা কি জানে না শার্লটের চাইতে এমিলির কাব্যপ্রতিভা কত বেশি। কুরারের কবিতায় যা অভাব এলিসের লেখায় তা পুরোমাত্রায় বর্তমান। বিষাদ গম্ভীর তার কবিতার সুর যেন অনন্ত লোকের সঙ্গীত, বিশ্বজগতের মাঝখানে কবিতার ভাব যেন সজোরে পাখা ঝাপটায় তার স্বাধীনতা, বলিষ্ঠতা আর মহিমা নিয়ে। এমিলি কিন্তু উপন্যাস বা কবিতার বিরূপ সমালোচনায় নির্বিকার। মনে আঘাত লাগলেও মুখে তার প্রকাশ নেই।

তখনকার দিনে ক্ষয়রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে কারো জ্ঞান ছিল না। কেউ জানতোই না যে রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এমিলির হাজার শরীর খারাপ লাগলেও সে বিছানায় একটুও শুয়ে থাকতে চাইতো না। বাড়িতে ডাক্তার আসতে দেখলে চটে যেতো, বাইরের কোনো সাহায্য তার দরকার নেই, এমনিভাবে নিশ্চিত মৃত্যুকে সে ডেকে আনলো। একদিনের জন্যও তার বিশ্রাম নেওয়া চলবে না। লড়াই করে, অগ্রাহ্য করে রোগকে ঠেকাতে হবে। এমিলি যেন সেই চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠলো।

ডিসেম্বরের মঙ্গলবার। সকালে উঠে এমিলি রোজকার মতোই সাজসজ্জা করলো। বোঝা গেল তার কষ্ট হচ্ছে। তবু কারো সাহায্য সে নেবে না। সেলাই নিয়ে সে বসলো। দাসদাসীরা এ ওর দিকে চাইতে লাগলো। তারা বোঝে গলার মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, কষ্ট করে নিঃশ্বাস ফেলা আর জ্বলজ্বলে চোখের মানে কী। সেলাই হাতে এমিলি একভাবেই বসে রইলো। সকাল গড়িয়ে দুপুর এল। এমিলির অবস্থা তখন আরো খারাপের দিকে। প্রবল শ্বাসকষ্ট। ফিস্ ফিস্ করে কথা বলা ছাড়া জোরে বলবার উপায় নেই। এমনিভাবে সময় এগিয়ে এল। যখন শেষ অবস্থা, তখন এমিলি বললো, "এইবার তোমাদের ডাক্তারকে ডাকতে পারো।"

প্রায় দুটোর সময় এমিলি মারা গেল। চার্চের আঙিনায় এমিলিকে কবর দেওয়া হলো। আর তার কোনো কষ্ট নেই। তার যন্ত্রণাও দিনরাত আর কাউকে দেখতে হবে না। এমিলির প্রিয় কুকুর কীপার (Keeper) শবযাত্রার সময় সঙ্গ নিয়েছিল। চুপ করে দেখছিল সব। বাড়ি ফিরে এমিলির শূন্য ঘরের দরজায় মাথা রেখে কী তার করুণ কান্না!

খাঁ খাঁ বাড়ি। বিরাট শূন্যতা যেন জমাট বরফের মতো। সারা বাড়িতে মৃত্যুর হিমেল হাওয়া। বাবা সারাক্ষণ বলতে থাকেন, "শার্লট, তুমি যেন ভেঙে পোড়ো না। সহ্য করো শার্লট। তুমি স্থির না হলে আমি যে মারা যাবো।" একদিকে অ্যান, আরেকদিকে

বাবা, শার্লটের তো শোকেরও সময় নেই। ঘুরে ঘুরে কেবল এই কথাই মনে হয়—এমন অকালে চলে গেল এমিলি? ফলন্ত গাছ গোড়া থেকে নিষ্ঠুরের মতো কে কেটে দিল। অনেক ঝড়ঝাপটা সয়েছে, এবার তার অনন্ত শান্তি।

অ্যানের মধ্যেও দেখা গেল একই লক্ষণ। ভয়ে ভাবনায় শার্লট পাগলের মতো। সবাই চলে গেল। একমাত্র ছোট বোন। যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। অ্যান এমিলির মতো নয়। বাঁচবার ইচ্ছে তার প্রবল। অসুখ ভালো করবার জন্য সে সব শুনতে প্রস্তুত। হাওয়ার্থের ডাক্তার ছাড়াও লীডস (Leeds) থেকে ডাক্তার আনা হলো। লীডসের ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে রায় দিলেন দুই ফুসফুসই ক্ষয়রোগে ঝাঁঝরা। কোনো ভরসা তিনি দিতে পারলেন না।

অ্যানের অসুখ ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল শেষের দিন আসন্ন। ইয়র্কশায়ারে দুরন্ত শীত। অপেক্ষাকৃত গরম আবহাওয়ায় নিয়ে গেলে যদি কিছু ভালো হয়। ডাক্তার নিষেধ করলেন। এই শীতে ঘরের বাইরে গেলেই অসুখ বাড়বে। তখন দুঃখ বা শোকের সময় নয়। অসীম ধৈর্য আর সাহসের সঙ্গে শার্লট বুক বাঁধলেন। দিন আর কাটে না; রাত্রি বিভীষিকা। ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন। শার্লট চমকে জেগে ওঠেন। মনে পড়ে এমিলির মৃত্যুর দিন। কী ভয়ঙ্কর সেই স্মৃতি। অ্যানকে হারানোর বেদনার চাইতেও তা ভয়ানক ভাবে তীব্র।

দুঃখের আঘাতে শালটের মন অসাড়। কোয়ার্টালি রিভ্যুতে 'জেন আয়ারের' বিরূপ সমালোচনাও তাকে এখন স্পর্শ করে না। সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন—'জেন আয়ার' যদি কোনো মহিলা লিখে থাকেন তবে তিনি মহিলা সমাজের উপযুক্ত নন।

শার্লট অ্যানকে স্কারবরায় (Scarborough) নিয়ে যাওয়া ঠিক করেছেন। কিন্তু সঙ্গে কে যায়? বাবাকে ফেলে শালটের নড়া মুস্কিল। শার্লট তাই এলেনকে চিঠি দিল অ্যানের সঙ্গে যাবার জন্য।

এপ্রিলেও শীত কমবার কোনো লক্ষণ নেই। অ্যান এদিকে যাবার জন্য অধীর। কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত মে মাসে যাবার দিন ঠিক হলো। মিঃ ব্রন্টি শার্লটকেও কিছুদিনের জন্য যেতে বললেন। তিনি যাহোক করে চালিয়ে নেবেন। অ্যান বাঁচবেনা, অ্যান মারা যাবে, এই চিন্তায় অবসন্ন মন নিয়ে শার্লট যাত্রার আয়োজন করতে বসলো।

২৪শে মে দুই বোন হাওয়ার্থ থেকে রওনা দিল। আগের দিন রওনা হবার কথা। ঠিক ছিল এলেন লীডস স্টেশনে অপেক্ষা করবে। সেখানে এরা পৌঁছলে সবাই এক সঙ্গে স্কারবরা যাবে। কিন্তু ২৩শে মে, সকালে অ্যান এত অসুস্থ হয়ে পড়লো যে সেদিন যাওয়া অসম্ভব। এলেনকে খবর দেবারও কোনো উপায় নেই। এলেন অপেক্ষা করে ওদের না পেয়ে তারপরদিন সোজা হাওয়ার্থে হাজির হলো। শার্লট আর অ্যান তখন রওনা হবার মুখে। স্কারবরা পৌঁছে অ্যানকে খুব খুশি দেখা গেল। মুখে চোখে উজ্জ্বল আভা। সারাদিন ওঁরা পাহাড়, সমুদ্র, দুর্গ দেখে বেড়ালেন। অ্যান বালির উপর গাধার পিঠেও চড়লো। খুশির তার সীমা নেই। সেদিনের সন্ধ্যা বড় সুন্দর। পাহাড়ের উপরকার দুর্গ অস্তসূর্যের আলোয় অপূর্বশ্রী। দূরের জাহাজগুলি পালিশ-করা সোনার মতো ঝকঝকে। জানলার কাছে ইজিচেয়ারে অ্যান বসে। বাইরের সব সৌন্দর্য যেন সে নিজের মধ্যে নিতে চায়। মুখে তার কথা নেই। মন ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন্ সুদূরলোকে।

রাত্রিও ভালোভাবে কাটলো। সকাল থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত আশঙ্কাজনক কিছুই ঘটলো না। হঠাৎ অ্যান বলে উঠলো, তার যেন কী রকম লাগছে। মনে হচ্ছে আর সময় নেই। ব্যস্তভাবে সে জানতে চাইলো এক্ষুণি বাড়ি যাবার ব্যবস্থা করলে সে কি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। ডাক্তারকে ডাকা হলো। শান্তভাবে অ্যান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো কতক্ষণ তার মেয়াদ। ডাক্তার যেন সত্যি কথাই বলেন। কারণ মৃত্যুকে সে ভয় পায়না। সত্যি কথা শুনবার মতো সাহস তার আছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাক্তার বললেন, আর সময় নেই, পরোয়ানা এসে গেছে। অ্যান ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানালো।

ক্রমশ অস্বস্তি বাড়তে লাগলো অ্যানের। কোনো কিছুতেই আরাম হয় না। শার্লটকে অ্যান বলে, "তোমরা আমাকে কেউ আরাম দিতে পারবে না। আমার কষ্টও আর বেশিক্ষণ নেই, শিগগিরই শেষ হবে।" শার্লট চোখের জল সামলাতে পারেন না। অ্যান বলে, "সাহস আনো শার্লট, মনে সাহস আনো।" এলেনকে অনুরোধ জানায়—"শার্লটের বোনের মতো কাছে কাছে থেকো, এলেন।" বেলা দুটোয় অ্যান চলে গেল পৃথিবী ছেড়ে। ঈশ্বরে বিশ্বাস তার একমুহূর্তের জন্যও টলেনি। চোখের উজ্জ্বলতাও ম্লান হয়নি।

অ্যানের মৃত্যু খুবই শোকের। কিন্তু এমিলির মৃত্যু দুঃস্বপ্ন। অ্যান মৃত্যুর জন্য যেন তৈরি হয়েই ছিল। ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করছিল ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য। ঈশ্বরে নিবেদিতা সে। মৃত্যু তার কাছে ভয়ের নয়। কিন্তু এমিলি? মৃত্যুকে সে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে হঠাৎই যেন সে চলে গেল। এমিলির বিদ্রোহী আত্মা তাকে বেঁচে থাকবারও সুযোগ দিলনা। কি দরকার ছিল অসময়ে তার যাবার? অ্যান নেই, এমিলি নেই, ব্রানওয়েল নেই। রইলো শুধু শার্লট। সব দিক দিয়ে যে অযোগ্য। রূপ নেই, গুণ নেই, ক্ষীণজীবী আর দুর্বল।

বাড়ি ফিরতেই অ্যানের পোষা কুকুর ফ্লসি খুশি হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে এল। শার্লট যখন এসেছে এবার অ্যানও আসবে। শূন্য ঘর, শূন্য খাবার টেবিল। যেখানে চার ভাইবোনের আসর জমতো, সেখানে শার্লট আজ একা। আর তিনজন রয়েছে কোন অন্ধকার অতলে। কোনোদিন তারা আর ফিরবে না। শূন্যতার হাহাকার শার্লটের মনের মধ্যে দিনরাত।

দশ

ভাইবোন সবারই স্বপ্ন ছিল লেখক হবার; নাম করবার। স্বপ্নের খোলস ছেড়ে সকলেই চলে গেল। পড়ে রইলেন একমাত্র শার্লট। লেখক হিসেবে নামও হলো। কিন্তু খ্যাতির ভাগ নিতে রইলোনা

কেউ। বোনদের মৃত্যুর পরেকার পাঁচ বছর শার্লটের সাহিত্যজীবনের ভরা জোয়ার। একই সঙ্গে আবার নিঃসঙ্গতা, অসুস্থতা আর হতাশায় ভরা। তাই কোনো আনন্দ নেই সে সার্থকতায়।

যে উপন্যাস শুরুতেই পড়ে ছিল আবার তাতে হাত দিলেন শার্লট। কিন্তু কল্পনা আর আবেগের রঙ আগের মতো সহজে এতে লাগলোনা। 'শার্লি'র (Shirley) বিষয়বস্তুও তাঁর চেনাজানা অভিজ্ঞতার মধ্যে নয়। রো-হেড স্কুলে পড়বার সময় কারখানায় যে গণ্ডগোল হয়েছিল তারই কাহিনী। এতে রোমান্স নেই, উত্তেজনা নেই. কতকগুলি সত্যি ঘটনার শান্ত পরিবেশন।

গল্পের পটভূমি ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ইংল্যাণ্ড। নেপোলিয়নের যুদ্ধের পর ব্রিটিশ পণ্যের রপ্তানী তখন প্রায় বন্ধ হবার জোগাড়। দাম্ভিক ও বেপরোয়া মিলমালিক ববার্ট গারার্ড মুর (Robert Garard Moore) এই সময়ে এমন একটি কল চালু করতে চাইলেন যাতে কম খরচে বেশি পণ্য উৎপাদন হয়। বস্ত্রশিল্পের তখন সঙ্কটজনক অবস্থা। মিলমালিকরা প্রায় দেউলে। শ্রমিকরা বেকার। ববার্টের কল চালু হলে স্থানীয় শ্রমিকদের দুরবস্থার সীমা থাকবে না। আশঙ্কায় ওরা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। প্রথমে ওরা বাধা দিতে চাইলো। কিন্তু রবার্ট সংকল্পে স্থির। তখন শ্রমিকরা লুডাইট্‌স (Luddites) নামে একটি দল গড়লো। উদ্দেশ্য—মিল ধ্বংস করে রবার্টকে মেরে ফেলা।

অর্থনাশ আর পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার দরুণ রবার্টের অবস্থা তখন সঙ্গীন। এ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সে অর্থশালিনী তরুণী শার্লিকে (Shirley) বিয়ের প্রস্তাব করে। রবার্ট কিন্তু শার্লিকে ভালোবাসে না। সে ভালবাসে ক্যারোলিনকে (Caroline)। শার্লি রবার্টকে অর্থ সাহায্য করতে রাজি হয় কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে যুদ্ধ থেমে গেল। রবার্টের আর দুর্দিন রইলো না। সে তখন ক্যারোলিনকেই বিয়ে করলো। শার্লির সঙ্গে বিয়ে হলো রবার্টের ভাই লুইয়ের (Louis)।

'শার্লি'র প্রধান ঘটনা ঐতিহাসিক। ঘটনাস্থল আর চরিত্র বাস্তব থেকে যথাযথ নেওয়া। হয়তো অজ্ঞাতে অথবা ইচ্ছে করেই শার্লট 'রো-হেডের' লোকদের কিছুমাত্র বদল না করে 'শার্লি' উপন্যাসে এনেছিলেন। ক্যারোলিনের কাকা হিরাম ইয়র্ক (Hiram Yorke) আর তার পরিবারের মধ্যে দেখা যায় মেরি টেলরের (Mary Taylor) বাবা আর তাঁর পরিবারবর্গকে। ক্যারোলিনের বিশেষত্ব এলেন নাসিকে (Ellen Nussey) মনে পড়ায়। কিন্তু মনের দিক থেকে সে শার্লটের প্রতিরূপ। শার্লির গভর্নেস আর ক্যারোলিনের হারিয়ে-যাওয়া মা মিসেস প্রায়রকে (Mrs Pryor) মিস উলারের মতো করে আঁকা হয়েছে। রবার্টের মধ্যে পাওয়া যায় মিঃ হেগারের কিছু আভাস আর শার্লির মধ্যে এমিলিকে। শার্লির মধ্যে এমিলির মিল পাওয়া গেলেও শার্লি পুরো এমিলি নয়। বহিরঙ্গে এমিলির সাদৃশ্য, ভিতরে এমিলির কোনো বিশেষত্ব, কোন গুণই নেই। অবশ্য আবরণটিকে মেজে ঘষে ঝকঝকে করে তোলা হয়েছে।

'শার্লি' লেখা শেষ হলে স্মিথ অ্যাডলারের অংশীদার জেমস টেলর পাণ্ডুলিপিটি হাওয়ার্থ থেকে লণ্ডনে নিয়ে গেলেন। খুব মনোমতো ওঁদের হয়নি। 'জেন আয়ারের' লেখিকার কাছ থেকে আরো ভালো উপন্যাস ওঁরা আশা করেছিলেন। তবু লেখাটি ছাপতে রাজি হলেন ওঁরা। ১৮৪৯ সনে 'শার্লি' ছাপা হয়ে বেরোলো। শার্লটের তখন শরীর খুবই অসুস্থ। অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে লণ্ডনে গিয়ে জর্জ স্মিথের মায়ের বাড়ি উঠলেন শার্লট। ফুসফুসের কোনো দোষ নেই জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলেন।

নিন্দা প্রশংসা দুইই সমান; তবু 'শার্লি' জনপ্রিয়তা অর্জন করলো। মিসেস গ্যাস্কেল আর হ্যারিয়েট মার্টিন্যু তখনো কুরার বেলের আসল পরিচয় জানেন না। তাঁরা দুজনেই প্রশংসা করে লিখলেন। থ্যাকারে লেখকের সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক হলেন। শার্লটের মহা সমস্যা। চেহারা সম্বন্ধে বরাবরের সঙ্কোচ। তাছাড়া ভদ্রসমাজে যাবার মতো পোষাকই তো নেই।

থ্যাকারের সঙ্গে প্রথম আলাপ শার্লটের কল্পনার সঙ্গে মেলেনি। থ্যাকারের প্রতিভা, ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যকৃতিতে শার্লট তাঁকে অসাধারণের কোঠায় বসিয়েছিলেন। নিজের দীনতা আর অযোগ্যতা নিয়ে কি করে তিনি অমন একজন গুরুগম্ভীর মেজাজের লোকের সামনে যাবেন সেই ভাবনায় অস্থির। থ্যাকারেও এই সরল, লজ্জাশীলা ছোটখাটো মেয়েটিকে দেখে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু খাবার সময় দেখলেন বিপদ। মেয়েটি তাঁকে মহাপুরুষ গোছের কিছু ঠাউরেছে। সে কথাই বলে না। অভিভূতের মতো চুপচাপ তাঁর মুখের কথা শোনার আগ্রহ নিয়ে বসে আছে। থ্যাকারে রসিক মানুষ। গল্প করতে বসলে এলোমেলো কত কথাই বলেন। সবাই সেগুলো রসিয়ে উপভোগ করে। কিন্তু অদ্ভুত এই মেয়েটি। এসব কথা যেন জীবনে শোনেনি। মুখে চোখে ফুটে ওঠে তার নিরাশার ছাপ। যতই সে ভাবে এইবার হয়তো অন্য ধরনের কথাবার্তা আরম্ভ হবে, ততই থ্যাকারে মজা করবার জন্য আরো হাল্কা, চটুল কথা বলতে থাকেন। তিনি যে গুরুদেব সেজে বাণী দেবেন এ তিনি মোটেই চান না।

হাওয়ার্থে ফিরে আবার সেই নিঃসঙ্গ জীবন। লণ্ডনের দিনগুলো কোথা দিয়ে কেটে গেল। সেখানে কত আনন্দ, কত সম্মান। যেখানেই গিয়েছেন শার্লট, সেখানেই সাহিত্যিক, গুণী লোকদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তাঁরা সমগোত্রীয়া হিসাবে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, সমমর্যাদা দিয়েছেন। হ্যারিয়েট মার্টিন্যুর সঙ্গে তো বন্ধুত্বই হয়ে গেছে শার্লটের। কিন্তু হাওয়ার্থের নিরানন্দ পারিবেশই তাঁর ভাগ্য। একে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কী?

১৮৪৯ সনে শীত খুব বেশি ছিল। শার্লটের শরীরও ভালো থাকে নি। বসন্তকালে মাঠ ঘাট যখন আমন্ত্রণ জানালো শার্লট বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। প্রতিটি জিনিষ মনে পড়িয়ে দেয় আরো অনেককে যারা আজ দূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। পাহাড়, প্রান্তর, বনের সঙ্গে ছিল এমিলির অচ্ছেদ্য যোগ। এমন কোনো ফুল নেই, গাছ নেই, জলাভূমি, পাহাড়, বন বা মাঠ নেই এমিলিকে যা মনে না পড়ায়।

অ্যানের মন ছিল সুদূরের প্রয়াসী। আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে নীলরঙ, কুয়াশা, ঢেউয়ের মতো মেঘ আর দিগন্তরেখা। ওরি সঙ্গে মিলিয়ে থাকে অ্যান।

এগার

কুরার বেলের পরিচয় বেশিদিন গোপন রইলো না। হাওয়ার্থের লোকরাও জানলো। অবাক কাণ্ড! তাদেরি গ্রামের মেয়ের লেখা। অথচ এতদিন তারা জানেনি? তারপর কাউকে কাউকে যখন উপন্যাসের পাতায় চেনা গেল, তখন 'শার্লি' পড়বার জন্য সে কী কাড়াকাড়ি! বাইরের থেকেও কেউ কেউ 'শার্লি'র লেখিকাকে দেখতে আসতো। একটুখানি দেখতে পাবার আশায় দেওয়ালের উপর দিয়ে চুপি চুপি তারা তাকিয়ে থাকতো। কেউ কেউ প্রার্থনা সভায় যোগ দিত। ব্রানওয়েলের এক বন্ধু তো গির্জায় যাবার পথে শার্লটকে দেখিয়ে দিয়ে রীতিমতো পয়সা রোজগার করতো। বাড়ির ঠিকানায় আসতে শুরু করলো রাশি রাশি চিঠি। কেউ দেখা করতে চায়। কেউবা নিজেদের লেখা পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে মতামত চায়।

'শার্লি' সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছিল 'দি টাইমস' (The Times) পত্রিকা। আর করেছিলেন জর্জ লিউইস (George Lewes) এডেনবরা রিভ্যুতে (Edenborough Review)। লিউইস নিজেই বইটি সমালোচনার জন্য চেয়ে নিয়েছিলেন। সমালোচনায় যেন বইটিরই গুণবিচার করা হয়, অনুরোধ জানিয়েছিলেন শার্লট। মেয়েদের কি লেখা উচিৎ আর কি নয় সেই মাপকাঠিতে যেন বিচার না হয়। লিউইস কিন্তু সে অনুরোধ রাখেননি। 'মেয়েলি সাহিত্য' বলে রচনার প্রতি তীব্র মন্তব্য করেছিলেন। শার্লট খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন শুধু একটি মাত্র কথায়—"শত্রুর হাত থেকে আমি নিজেই নিজেকে বাঁচাবো, ঈশ্বর আমাকে আমার বন্ধুর হাত থেকে বাঁচান।"

থ্যাকারের সঙ্গে আবার শার্লটের দেখা হয়েছিল মিঃ স্মিথের ওখানে। শার্লট সেদিন থ্যাকারেকে অনুযোগ করেছিলেন তাঁর চটুল কথাবার্তার জন্য। ওঁদের দুজনের মেজাজ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তা সত্বেও থ্যাকারের সঙ্গে শার্লটের সম্প্রীতির অভাব ছিল না।

ল্যাঙ্কাশায়ারের ডাক্তার সার জেমস-কে-শাটলওয়র্থ (Sir James Kay-Shuttleworth) তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে হাওয়ার্থ এসেছিলেন। শার্লটকে তিনি ল্যাঙ্কাশায়ার আর লেক ডিস্ট্রিক্টে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন। মিঃ ব্রন্টি শার্লটের জন্য খুবই গর্ববোধ করছিলেন। তিনিও শার্লটকে যাবার জন্য বারবার করে বললেন। কে-শাটলওয়র্থের উইণ্ডারমেয়ারের বাড়িতেই শার্লট মিসেস. গ্যাস্কেলের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন। মিসেস গ্যাস্কেলের মধুর ব্যবহারে শার্লট তাঁর কাছে সহজ হয়ে ওঠেন। লাজুক স্বভাব ভুলে তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন। মিসেস গ্যাস্কেলই প্রথম শার্লটের জীবনী লিখেছিলেন।

জন স্মিথের সঙ্গে শার্লটের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়ে উঠেছিল। স্মিথের মার এটা ভালো লাগেনি। শার্লটের হাবভাব, চেহারা কিছুই তাঁর পছন্দ নয়। লেখিকা ভালো হতে পারে। ছেলের যোগ্য স্ত্রী সে কিছুতেই হতে পারে না। জর্জ স্মিথ বাস্তবিকই বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন কিনা জানা যায় না। এলেন নাসি এই ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করে লিখেছিল। উত্তরে শার্লট জানিয়েছিলেন জর্জকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। তবে দু'জনের মধ্যে রূপ, গুণ, পদমর্যাদা ও আর্থিক অবস্থার এত তফাৎ যে বিয়ের কথা ভাবা অসম্ভব।

নারী হিসাবে শার্লটের পুরুষকে আকর্ষণ করার মতো রূপ নেই, স্বভাবেও তিনি লাজুক। কারো মনেই শার্লটের ছাপ পড়ে না। কিন্তু তবু ব্যতিক্রম ঘটে। জর্জ স্মিথের শার্লটকে ভালো লেগেছিল। তাছাড়া স্মিথ অ্যাডলার কোম্পানীর অংশীদার জেমস টেলরও (James Taylor) শার্লটের প্রতি আকৃষ্ট হন, বিয়ে করার জন্য পীড়াপীড়িও করেন। ব্যবসাসংক্রান্ত কাজে তাঁর পাঁচ বছরের জন্য ভারতে যাবার কথা; তার আগেই তিনি বিয়েটা চুকিয়ে ফেলতে চান। শার্লট ভেবে

পাননা কি করা উচিত। জেমসের প্রস্তাবে রাজি হতে চান, কিন্তু শেষ মুহূর্তে কী ভেবে পিছিয়ে পড়েন। জেমসকে ভালোবাসতে তাঁর মন নারাজ। শার্লটের কল্পনার সঙ্গে জেমসকে মেলানো যায় না। মনের উৎকর্ষতায় জেমস অনেক নিচে। তাঁকে বিয়ে করলে বেদনা আর আত্মগ্লানির সীমা থাকবে না। তবু নিজের ভবিষ্যৎ, সাংসারিক পরিস্থিতি, বাবার অবস্থা, সব বিবেচনা করে শার্লট মত দেওয়াই ঠিক করলেন। জেমস যখন শেষ নিষ্পত্তি করবার জন্য হাওয়ার্থে এলেন, শার্লট তখন মনে মনে প্রস্তুত। কিন্তু যে মুহূর্তে জেমসকে কাছে দেখলেন, শার্লটের সব অনুভূতি বরফের মতো জমাট। মত দেওয়া হলো না। জেমস নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন। যিনি মিঃ হেগারকে ভালোবেসেছেন, জর্জ স্মিথকে কাছে থেকে জেনেছেন তিনি কি অতি সাধারণ একজনকে গ্রহণ করে নিজেকে প্রতারণা করতে পারেন?

প্রকাশক তাড়া দিচ্ছেন আরেকটি বইএর জন্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুরু করতে হয়। জর্জ স্মিথ বলেছিলেন ডিকেন্স আর থ্যাকারের মতো ধারাবাহিক ভাবে লিখতে। শার্লটের তা পছন্দ নয়। সেভাবে লেখা তাঁর আসে না। পুরোটা না হলে খানিকটা ছাপার অক্ষরে দেখা তাঁর ভালো লাগে না। কিন্তু কী নিয়ে লেখা যায়? অভিজ্ঞতাই বা কই হলো জীবনের? মনে পড়ে ব্রাসেল্সের দিন। আট বছর পরেও সে স্মৃতি তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি বেদনাময়। তবে সময় আর অভিজ্ঞতায় তার রূপবদল ঘটেছে। ব্রাসেল্সের দিন নিয়ে কিছু লেখা যায় অবশ্য। কিন্তু সঙ্কল্প কাজে পরিণত হতে চায় না। বিরস, নিঃসঙ্গ জীবন হতাশায় গুঁড়িয়ে যেতে চায়। কোনো কিছুতেই উৎসাহ পাওয়া যায় না। শরীর দিনদিন ভেঙে পড়ে। শীতের সময় আরো কষ্ট। ঠাণ্ডা লাগা, বুকে ব্যথা। বারবার মনে হয় এমিলি আর অ্যানের কথা। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে শার্লট বুকে যেন ওদেরি যন্ত্রণা বোধ করেন। শুরু হয় অনিদ্রা, অক্ষুধা, মাথার যন্ত্রণা, বমি বমি ভাব। শরীর এত দুর্বল আর রোগা যে লোকে দেখলে ভয় পায়। বংশগত ক্ষয় রোগ তাঁকেও ধরলো বুঝি। এবার

নিশ্চয় শার্লটের যাবার পালা। কিন্তু না, তখনো তাঁকে ক্ষয়রোগে ধরেনি। শুধু কয়েক মাস লেখা বন্ধ রেখে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হলো শার্লটকে।

শরীর একটু সুস্থ হতেই আরেক বিপদ। মিঃ ব্রন্টি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হতে আরম্ভ করলো। উপন্যাস লেখা আর এগোয় না। সবকিছু ফেলে শার্লট সেবা যত্নে বাবাকে সারিয়ে তোলার দিকেই বেশি মন দেন।

অবশেষে অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে নতুন উপন্যাস 'ভিলেট' (Villette) লেখা শেষ হলো। জর্জ স্মিথের কাছে দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে মতামত চাইলেন শার্লট। ব্যাপারটার মজা শার্লট হয়তো বুঝতে পারেননি। কিন্তু উপন্যাসের নায়ক জন গ্র্যাহাম ব্রেটনের (John Graham Breton) চরিত্রে জর্জ স্মিথ, মিসেস ব্রেটনের চরিত্রে জন স্মিথের মা, আর লুসি স্নোর (Lucy Snowe) চরিত্রে যে শার্লটের রূপই ফুটেছে, সেটা বুঝতে জর্জ স্মিথের দেরি হয়নি। শার্লট পরম নিশ্চিন্ত যে জর্জ স্মিথ কিছু ধরতেই পারবেন না। তাই এই চরিত্রগুলি নিয়ে তাঁর কোনো সঙ্কোচ নেই। তৃতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে শার্লট বলেন—"জনকে লুসির বিয়ে করা মোটেই উচিত নয়। জন কত সুন্দর, কত মার্জিত, মিষ্টি স্বভাব, চটপটে, বড়লোক। জীবনের লটারিতে যোগ্য পুরস্কারই সে পাবে। তার স্ত্রী হবে ধনীর দুলালী, হাসিখুশি আর পরমাসুন্দরী। লুসি বিয়ে করলে প্রফেসরকেই করা উচিৎ।"

মিঃ ব্রন্টি অধীর আগ্রহে উপন্যাসটির শেষ অধ্যায়ের জন্য অপেক্ষা করেন। শেষটা যেন দুঃখের না হয়, বারবার এই অনুরোধে শার্লটকে বিব্রত করে তোলেন।

ব্রাসেল্‌সে যে মন নিয়ে গিয়েছিলেন শার্লট সে মন তাঁর কবে মরে গেছে। তবু সে অভিজ্ঞতা মিথ্যে হয়ে যায়নি। অনেক কিছু বদলানো যায়, চাপা দেওয়া যায়, কিন্তু জীবনের সত্যকে যায় না। শার্লটের প্রেম জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। লুসি স্নোর সঙ্গে পল

এমান্থ্যয়েলের (Paul Emanuel) মিলন কি আর সম্ভব? পল এমান্থ্যয়েল বেঁচে থেকে সুখী হতে পারে না। শার্লট তাই এমান্থ্যয়েলের ভবিষ্যৎ—মৃত্যু অথবা বেঁচে থাকার সম্ভাবনা—পাঠকদের উপর ছেড়ে দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করলেন। তৃতীয় খণ্ড শেষ হবার পর স্বস্তি, দীর্ঘ বিরাম। সামনে দুরন্ত শীতের দিন। সঙ্গীবিহীন নির্জনতায় দিনের পর দিন কাটে। এমন কোনো ঘটনাই ঘটে না যাতে একটু একঘেয়েমির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। বাবা আছেন কিনা বাড়িতে টেরও পাওয়া যায় না। বসবার ঘরের একপাশে বসে থাকেন। কখনো একটু পড়েন, কখনো ঝিমোন কিংবা চুরুট খান। খাবার সময় একা বসে খান। বাবা থাকতেও যে নিঃসঙ্গতা, মৃত্যুর পরও তাই। এই শার্লটের ভবিষ্যৎ। এর সঙ্গে মানিয়ে নিতেই হবে নিজেকে। নইলে বাঁচাই কঠিন। বিয়ের কোনো কল্পনা যদি থেকেও থাকে, এবার তা মন থেকে মুছে ফেলতে শার্লট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জর্জ স্মিথ মরীচিকার মতো। জেমস অনেক দূরের লোক। চিঠিপত্রও বন্ধ এখন। সবই ভাগ্য বলে মানতে চাইলেন শার্লট। কিন্তু মেনে নেওয়াই সব নয়। বিয়ে না হওয়া বড় দুঃখ নয়, বড় দুঃখ নিঃসঙ্গ জীবনের হতাশা।

বার

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। মাত্র তিন বছরের কাহিনী। একক জীবনের দুঃখের গুরুভার শেষের দিকে আর একা বইতে হয়নি শার্লটকে। হাওয়ার্থ চার্চের সহকারী পাদ্রী রেভারেণ্ড আর্থার বেল নিকলস (Rev. Arther Bell Nicolls) শার্লটের পাণিপ্রার্থী হলেন। ১৮৪৪ সনে তিনি হাওয়ার্থে এসেছিলেন। কবে থেকে তিনি শার্লটের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলা কঠিন। তবে ১৮৫২ সনের শেষের দিকে তাঁর মধ্যে একটা অন্যরকম ভাব শার্লটের চোখে পড়ছিল। একদৃষ্টে তিনি শার্লটের দিকে তাকিয়ে থাকেন; পারতপক্ষে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন না, কখনো ভীষণ মনমরা ভাব, প্রায়ই কাজ ছেড়ে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ

করেন। ভারি লাজুক আর নার্ভাস স্বভাব। মুখ ফুটে কোনোদিন অনুরাগের কথা বলতে পারেননি। দীর্ঘকাল গোপন প্রেম মনের মধ্যে লালন করে শেষ পর্যন্ত তা অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো। বাধ্য হয়ে শার্লটকে সব কথা জানানো প্রয়োজন বোধ করলেন। ১৮৫২ সনের ডিসেম্বর মাস। একদিন রাত্রে মিঃ ব্রন্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আর্থার নিকলস্ বিদায় নিলেন। এইবার সদর দরজা খুলে বেরিয়ে যাবেন। শার্লট শোবার ঘরে। হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাত। মিঃ নিকলস্ ঘরে ঢুকে শার্লটের সামনে দাঁড়ালেন। মুখচোখ অসম্ভব ফ্যাকাশে; সারা গা থরথর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজই প্রায় শোনা যায় না। অনেক চেষ্টার পর শার্লটকে তিনি মনের কথা জানালেন।

কোনো পাদ্রীকে বিয়ে করা শার্লটের কল্পনার বাইরে। আরো একজন পাদ্রী—এলেনের ভাই হেনরী নাসি (Henry Nussey) শার্লটের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। শার্লট রাজি হননি। আবার সেই পাদ্রী—আর্থার নিকলস্? শার্লট তাঁকে বুঝিয়ে বিদায় দিলেন। তাছাড়া মিঃ ব্রন্টিকে না জানিয়ে সরাসরি শার্লটাকে প্রস্তাব করতে আর্থার পারেন না। তখনকার দিনের তাই রীতি। আর্থার চলে যাবার পর শার্লট নিজেই ব্যাপারটা জানাতে গেলেন বাবাকে। ভালো করেই জানা ছিল যে মিঃ ব্রন্টি আর্থার নিকলস্‌কে একেবারেই পছন্দ করেন না। মিঃ ব্রন্টি খুব চটে গেলেন। রাগে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠলো—"ঐ পাদ্রীটা? ঐ একেবারে সাধারণ লোকটা? আমার মাইনে করা পাদ্রীটা? তার এত দুঃসাহস?" শার্লট অতিকষ্টে তাঁকে শান্ত করলেন। বাবাকে কথা দিলেন আর্থার নিকলস্‌কে কিছুতেই বিয়ে করবেন না।

শার্লটের প্রত্যাখ্যানে আর্থার একেবারে ভেঙে পড়লেন। আহার নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড়। চার্চেও যাওয়া তিনি ছেড়ে দিলেন। লোকজনের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। শার্লটের মনেও কষ্ট। এমনতো ছিলেন না মিঃ নিকলস্। নিকলস্‌কে কেউই

যেন পছন্দ করেন না। এমনকি দাসদাসীরাও না। সকলের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত লোকটির মনে এত আবেগ? সহ্যের শক্তিও যেন অসীম। দুঃখ আর প্রেমে ব্যর্থতা উভয় অভিজ্ঞতাতেই নিকলস্ যেন শার্লটেরই জুড়ি।

মিঃ নিকলস্ হাওয়ার্থ গ্রামকে আর সইতে পারছেন না। তিনি পদত্যাগ পত্র দিলেন। মিশনারি সোসাইটির কাজে অস্ট্রেলিয়া যাবার কথা হলো তাঁর। তাঁকে নেওয়া হবে কিনা ঠিক করতে সোসাইটির একটু সময় লাগলো। সে ক'দিন বাধ্য হয়েই নিকলস্‌কে হাওয়ার্থে থাকতে হলো।

১৮৫৩ সনের জানুয়ারিতে 'ভিলেট' (Villette) প্রকাশিত হলো। সকলেরই প্রশংসা পেল উপন্যাসটি। একমাত্র হ্যারিয়েট মার্টিন্যু বইটিতে আবেগের আতিশয্যের নিন্দা করলেন। আর্থার নিকলস্ হাওয়ার্থে রইলেন বটে, কিন্তু ধৈর্য ও প্রতীক্ষায় তাঁর এখন ভাঙন ধরেছে। সব আশার মূলে পড়েছে কুঠারাঘাত। দিন আর কাটেনা। ভাব দেখে সবাই ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। শার্লটও এই বাড়াবাড়িতে অসন্তুষ্ট হন। তাঁকে একটিবার চোখের দেখা দেখবার জন্য নিকলসের ব্যাকুলতায় সকলের কাছে অপ্রস্তুত বোধ করেন। এখন যত শীগগির নিকলস্ চলে যান ততই মঙ্গল। সহানুভূতি, করুণা হয় বৈকি। কিন্তু শোকের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি দিনরাত চোখের সামনে ভালো লাগে না।

মিশনারি সোসাইটি চিঠি দিলেন নিকলস্‌কে লণ্ডনে গিয়ে দেখা করবার জন্য। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো যেন। মনে হচ্ছে চিঠি না এলেই ভালো হতো। অথচ এই জন্যই তাঁর এতদিন অপেক্ষা। এখানে তবুতো শার্লটকে চোখে দেখতে পাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়া গেলে সে সুখটুকুও বরবাদ। শার্লট তাঁকে না চাইলেও, প্রাণ থাকতে তিনি ছাড়তে পারবেন না শার্লটের আশা। একদিন না একদিন মনের বদল হতেও তো পারে। সেই ক্ষীণ আশায় মিঃ ব্রন্টিকে নিকলস্ জিজ্ঞাসা করলেন পদত্যাগ পত্রটি ফিরিয়ে নিতে পারবেন কিনা। মিঃ ব্রন্টি

এবার তাঁকে হাতের মুঠোয় পেলেন। রাজি হলেন। তবে এই শর্তে যে বিয়ের প্রস্তাব কোনোদিন আর তিনি করবেন না। এই নিদারুণ শর্তে অবশ্যই নিকলস্ রাজি হলেন না। পদত্যাগ পত্রও বহাল রইলো।

লণ্ডন যাত্রার সময় এগিয়ে এল। শার্লট যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন নিকলস্ চলে গেলে। অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতিতে মনে তাঁর এতটুকু শান্তি নেই। তবে নিকলসের জন্য একটু অনুকম্পা রয়েছে শার্লটের মনে। যাবার আগে নিকলস্ এলেন মিঃ ব্রন্টির কাছে শেষ বিদায় নিতে। শার্লটের কাছে বিদায় নেবার মতো মনের অবস্থা নয়। সদর দরজা পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পা সরে না। বহুক্ষণ একভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে। শার্লটের মনে হলো তাঁরই একবার যাওয়া উচিৎ। গিয়ে দেখেন নিকলসের তখন কথা বলা বা তাকিয়ে দেখার অবস্থা নয়। বাগানের দরজায় হেলান দিয়ে মাথা নিচু করে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন। কী সান্ত্বনা দিতে পারেন শার্লট? যে সান্ত্বনা, যে উৎসাহ তাঁর দরকার তাতো দিতে তিনি পারবেন না।

মিঃ নিকলস্ লণ্ডনে চলে গেলেন। আবার বাড়িতে নামলো অদ্ভুত নীরবতা। জীবন চললো ঘড়ির কাঁটার মতো। কেউ আসে না, কেউ শান্তি ভঙ্গ করে না। মৃত্যু-নিথর স্তব্ধতা ছড়ানো চারদিকে।

ধৈর্য আর আন্তরিক চাওয়ার কিছু মর্যাদা মেলেই। আর্থার নিকলস্ও শার্লটকে চিঠি দিয়ে জবাব পেলেন। এমনকি বাবার অজ্ঞাতসারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও রাজি হলেন শার্লট। বেচারি মনে বড় কষ্ট পেয়ে গিয়েছে। দেখা করলে যদি একটু আনন্দ পায় ক্ষতি কি? তাছাড়া বাবার অন্যায়, রূঢ় ব্যবহারের লজ্জাও তো তাঁরই। এমন করে চিঠি লেখেন আর্থার যে জবাব না দিয়ে পারা যায় না। দেখা করতে ছুটে ছুটে আসেন হাওয়ার্থের পাশের গ্রামে। বাবাকে এভাবে ঠকিয়ে শার্লট মনে মনে খুবই অনুতপ্ত। কিন্তু আর্থার নিকলসের দুর্দশা দেখে এটুকু আনন্দ থেকে তাঁকে বঞ্চিতও করতে চান না।

শার্লট ও আর্থারকে নিয়ে ক্রমশ গুজব ছড়াচ্ছে। বন্ধু এলেন আর মেরী টেলরের কানে এ খবর পৌঁছলে তারা তো শার্লটের সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ছাড়বার জোগাড়। শার্লট কি করবেন ভেবে পাননা। আলাপ করে বুঝেছেন লোকে যতখানি অবজ্ঞা করে ঠিক ততখানি অবজ্ঞার পাত্র আর্থার নন। এমন করে শার্লটকেও কেউ চায়নি কখনো। কী দরকার তাঁকে ফিরিয়ে দেবার। আর তো কেউ আসবে না কোনোদিনও—কোনো কল্পকথার রাজপুত্র। কিন্তু শ্রদ্ধা, করুণা ছাড়া শার্লটের মনে তো অনুরাগের রঙ নেই। তবু ভাবেন তাঁর তরফ থেকে ভালোবাসার ঘাটতি আর্থারের ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। আর্থারকে সুখী দেখবার ইচ্ছে হলো শার্লটের। নিজেরও অসুখী একক জীবনে অবলম্বন দরকার।

আর্থার নিকলস্ শার্লটের নারীত্বকে চেয়েছিলেন বলেই শেষ পর্যন্ত সাড়া পেলেন। কুরার বেলকে তিনি বোঝেন না, বোঝেন শার্লটকে। জর্জ স্মিথ শার্লটের মধ্যে দেখেছিলেন লেখিকাকে, নারীকে নয়। নারীকে জানবার আগেই লেখিকাকে ভালোবেসেছিলেন জেমস টেলর। হেনরী নাসি আর মঃ হেগার দুজনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন শার্লটের প্রতিভাদীপ্ত মনে। কোনো না কোনো কারণে ওঁরা প্রত্যেকেই শার্লটের জীবন থেকে সরে দাঁড়ালেন। সব শেষে এলেন আর্থার নিকলস্ যিনি মনেপ্রাণে শুধু নারীকেই চান।

মিঃ ব্রন্টি প্রথমে দারুণ চটে গেলেন। পরে অনেক ভেবেচিন্তে মত দিলেন বিয়েতে। নিকলসের বদলে যিনি পাদ্রী হয়ে এসেছিলেন তিনি একেবারেই অযোগ্য। কাজকর্ম মোটেই ভালোভাবে করতে পারছিলেন না। সেদিক দিয়ে নিকলসের তুলনা নেই। তাছাড়া বিয়ের পর ওঁরা একসঙ্গে থাকলে আর্থিক দিক দিয়েও সুবিধে হবে। অতএব বিয়ের তোড়জোড় চলতে লাগলো এবং ২৯শে জুন অনাড়ম্বর ভাবে বিয়ে শেষ হলো। নিকলসের এক বন্ধু আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পন্ন করলেন। মিঃ ব্রন্টি চার্চে যেতে পারলেন না, কন্যা সম্প্রদান করলেন মিস উলার। শাদা কাজ করা মসলিনের পোষাক, শাদা লেস দেওয়া

কোট আর মাথার শাদা অবগুণ্ঠনে শার্লটকে দেখাচ্ছিল ছোট্ট একটি তুষারকন্যা। নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও কম। বিয়ের উৎসবেও শার্লট একা। তাঁকে ঘিরে আনন্দ-উৎসব করবার মতো তেমন কেউ ছিল না।

শার্লটকে নিয়ে এলেন নিকলস্ জন্মভূমি আর্য়ল্যাণ্ডে। সেখানকার পরিবেশ আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে নিকলস্কে যেন নতুন করে আবিষ্কার করলেন শার্লট। শার্লটের সংস্পর্শে এসে নিকলসেরও স্বভাবের অনেক বদল হলো। নিকলস্ কাজেকর্মে তৎপর। চার্চের কাজে একনিষ্ঠ। তিনি চান তাঁর সব কাজে শার্লট থাকুক সঙ্গে। শার্লটের নিজের বলতে কোনো সময়ই থাকে না। এমনভাবে জড়িয়ে থাকতে শার্লট কখনো অভ্যস্ত নন। না লিখে তিনি কি করে থাকবেন; তবু যথাসাধ্য নিকলসের মনস্তুষ্টি করতে চান শার্লট। এবার তাঁর বাস্তবের সঙ্গে পরিচয়। স্ত্রী হওয়া যে কত দায়িত্বের, কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝবার পালা এবার তাঁর।

নিকলস্ শার্লটের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগী। উপন্যাস লেখা দূরে থাক শার্লট চিঠি লিখতে বসলেও টেবিলের ধারে অধীর হয়ে তিনি অপেক্ষা করে থাকেন কখন শেষ হবে, কখন তাঁরা বেরোবেন। বন্ধুবান্ধবকে চিঠি লিখলেও সেটা পড়তে চান। এলেনকে বরাবর সব খুলে লেখা অভ্যাস শার্লটের। নিকলস্ তা পছন্দ করেন না। উপন্যাস লিখতে বসলে তাঁর ঈর্ষ্যা হয়। অথচ শার্লটের প্রশংসা হোক তাও তিনি চান। নতুন উপন্যাস 'এমা' (Emma) কিছুটা শুনে মন্তব্য করেছিলেন—বিষয়বস্তু পুরোনো, একই জিনিস বারবার লিখলে লোকে পছন্দ করবে না।

আর্য়ল্যাণ্ডে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর সময় একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আঘাত পাওয়া ছাড়া শার্লটের শরীর মোটামুটি বেশ ভালোই ছিল। হঠাৎ একদিন বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ঝরণার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দিনটা ছিল বেশ ভালো। গরমে তুষার গলতে আরম্ভ করেছে, আবহাওয়া

পরিষ্কার। কিন্তু ফেরার পথে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। বাড়ি ফিরে শার্লটের খুব মাথার যন্ত্রণা। ঘনঘন বমি আর মূর্ছা। ব্যস্ত হয়ে নিকলস্ ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তার বললেন ভয়ের কিছু নেই। শার্লট সন্তানসম্ভবা। একটু সহ্য করে থাকলে, সাবধানে থাকলে আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অসুখ বিসুখের সব জ্বালা যন্ত্রণা শার্লট এ পর্যন্ত সহ্য করেই এসেছেন। কিন্তু এবারকার দারুণ যন্ত্রণা যে সহ্য করা যায় না। খাবার দেখলেই বমির ভাব। মুখে কিছুই তোলা যায় না। পুষ্টির অভাবে শরীর রোগা হয়ে যেতে লাগলো। সন্তানসম্ভাবনার কষ্টের আড়ালে আরেকটি রোগ আত্মগোপন করেছিল। যে রোগে মারিয়া গিয়েছে, এমিলি গিয়েছে, এলিজাবেথ, ব্রানওয়েল, অ্যান গিয়েছে সেই দুরন্ত ক্ষয়রোগ। কেউ বোঝেনি কোন্ সুযোগে শার্লটের বুকেও সে বাসা বেঁধেছে। নিকলস্ প্রাণপণ সেবা করে চলেছেন। কিন্তু কষ্টের উপশম নেই। কিছুদিন এভাবে চলবার পর কিছু বদল দেখা গেল। শার্লট কিছু খেতে পারতেন না, এখন তিনি খাবার খেতে চাইলেন। কিন্তু অচিরেই অবস্থা আরো অবনতির দিকে গেল। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকেন শার্লট। মাঝে মাঝে ভুল বকেন। সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ মেলে সামনে দেখেন নিকলসের উদ্বিগ্ন মুখ। মনে হয় তাঁর জন্য নিকলস্ যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

"আমি কি মরে যাচ্ছি?" বিড়বিড় করে বলার চেষ্টা করেন শার্লট। "সত্যিই মরে যাচ্ছি? ভগবান কি আমাদের দুজনকে আলাদা করে দেবেন? খুবই সুখে ছিলাম যে আমরা।"

৩১ মার্চ রবিবার ভোরবেলা হাওয়ার্থ-গির্জার ঘণ্টা সকলকে জানালো শার্লট আর নেই। সারাজীবন সুখের স্বপ্ন দেখেছেন শার্লট। সে স্বপ্ন কি কিছুটা সার্থক হলো যাবার আগে? সব দুঃখযন্ত্রণার শেষে এই কথা তাই রয়ে গেল মুখে—

'খুবই সুখে ছিলাম আমরা!'

শার্লট ব্রন্টির উপন্যাস

জেন আয়ার

(গল্প-সংক্ষেপ)

"গল্পের নায়িকা মাত্রেই অপূর্ব রূপসী না হলে লোকে তার কদর করবে না, এ ধারণা ভুল।" এমিলি আর অ্যানকে শার্লট ব্রন্টি বলেছিলেন, "তোমরা তোমাদের গল্পের নায়িকাকে সুন্দরী করে অন্যায় করেছ। আমার গল্পের নায়িকাকে আমি করবো অতি সাদাসিদে, সে হবে আমারই মতো; চেহারায় অতি সাধারণ, লোকের চোখকে টানবার মতো কিছুই থাকবেনা তার। অথচ সেই সাধারণ মেয়েই পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করবে।"

শার্লটের জেন আয়ার সেই অতি সাধারণ মেয়ে। জন্মের অল্পকালের মধ্যেই মা-বাবাকে হারিয়ে গেটস্‌হেডে (Gateshead) মামার বাড়িতে জেন প্রতিপালিত হয়। মামা মিঃ রীড (Reed) মারা যাবার পর মামী তার প্রতি খুব নিষ্ঠুর আচরণ করতে থাকেন। তাঁর কঠোর শাসনে ভীত সন্ত্রস্ত জেনের দিন কাটতে থাকে। নিষ্ঠুরতা চরমে উঠলে একদিন জেন মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করে বসলো। মিসেস রীডের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে সে বললো:

"তুমি আমার কেউ না, তাতে আমি খুবই খুশি। কোনোদিনও আমি তোমাকে মামীমা বলে ডাকবোনা। বড় হয়ে কোনোদিনও কাছে আসবোনা। তুমি আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করো কিংবা আমি তোমাকে কেমন পছন্দ করি, এ কথা কেউ জানতে চাইলে আমি বলবো তোমার চিন্তাও আমার কাছে অসহ্য। আরো বলবো কতখানি নিষ্ঠুর ব্যবহার তুমি করেছ।"

"কোন্ সাহসে তুই এ কথা বলছিস জেন আয়ার?"

"কোন্ সাহসে, মিসেস রীড? কোন্ সাহসে? কারণ এযে সত্যি কথা। তুমি মনে করো আমার কোনো বোধ নেই! ভালোবাসা বা স্নেহ কোনোটা না পেলেও চলবে আমার! কিন্তু আমিতো সে ভাবে বাঁচতে পারিনা।......"

জেনের উদ্ধত ব্যবহারে মিসেস রীড স্তম্ভিত। তাকে আর কাছে রাখা নিরাপদ নয়। আধা-দাতব্য লো-উড (Low-wood) বোর্ডিং স্কুলে তাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। লো-উড স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ব্রকল্‌হার্স্টকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো কতখানি সাঙ্ঘাতিক মেয়ে জেন। তাকে সর্বদা শাসন আর শাস্তির মধ্যে রাখা প্রয়োজন—একথাটা মিসেস রীড বারে বারে বলে দিলেন।

জেনের স্কুলের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায়, আধপেটা খেয়ে, প্রতিনিয়ত ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ভৎর্সনা সহ্য করে সেখানে তার দিন কাটে। তবু সান্ত্বনা, সে লেখাপড়া শিখতে পারছে। বোর্ডিংএর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিস টেম্পলই (Temple) একমাত্র এই মেয়েটির উপর সদয়। সব মেয়েই মিস টেম্পলকে ভালোবাসে। কিন্তু মেয়েদের জন্য কোনোকিছু করবার ক্ষমতা তাঁর নেই। স্কুলের সব কাজেই মিঃ ব্রকল্‌হার্স্টকে জবাবদিহি করতে হয়। শীতের সময় ওখানে মেয়েদের বড় কষ্ট। উপযুক্ত পোষাকের অভাবে হাত পা ঠাণ্ডায় ফুলে যায়, ফোঁড়া বেরোয়। খাবারও পর্যাপ্ত নয়। একমাত্র রবিবারেই তারা স্কুলের বাইরে গির্জায় যেতে পারে। দু মাইল ঘুরে প্রবল শীতে, বরফের মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে তারা যায়। ফিরে এলে প্রত্যেককে এক টুকরো রুটি আর মাখন খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রায়ই বড় মেয়েরা ছোটদের ভয় দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে রুটি নিয়ে নিজেরা খেয়ে ফেলে।

একদিন মিঃ ব্রক্‌লহার্স্ট এসে সবাইকে জড়ো করে বল্লেন, "শোনো তোমরা।" তারপর জেনকে একটি টুলের উপর উঠিয়ে তার সম্বন্ধে মিসেস রীডের কাছ থেকে যা শুনেছেন সেইসব ঘটনা বলতে লাগলেন। বল্লেন সবাই যেন জেন আয়ার সম্পর্কে সাবধান হয়,

পারতপক্ষে ওর সঙ্গে যেন কেউ না মেশে। মিঃ ব্রক্‌লহার্স্ট চলে গেলে জেনের মনে হলো সে যেন একেবারে একঘরে। তবু হেলেন বার্নস নামে একটি মেয়ে তাকে ভালোবাসে। সে ছাড়া আর কেউ তাকে বোঝে না। হেলেন বার্নসের প্রকৃতি খুব মৃদু ও মধুর। সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচার সে মুখ বুঁজে সহ্য করে ঈশ্বরের দান বলে। হেলেনই জেনের একমাত্র বন্ধু। কিন্তু তার এই সর্বংসহ ভাব এবং সকলকে ক্ষমা করা জেন বুঝে উঠতে পারে না। শীত কেটে গিয়ে বসন্ত আসে। সঙ্গে দেখা দেয় মহামারী—টাইফাস রোগ! ৮০টি মেয়ের মধ্যে ৪৫ জন এক সঙ্গে অসুখে পড়ে। স্বভাবতই স্কুলের নিয়মকানুন তখন শিথিল। বাকি মেয়েরা যা খুশি তখন করতে পারে। হেলেন অসুখে পড়ায় হেলেনকে বাদ দিয়ে জেন তার নতুন বন্ধু মেরী অ্যান উইলসনকে নিয়ে প্রায় রোজই বনের মধ্যে বেড়াতে যায়। এদিকে হেলেনের শরীরে ক্ষয়রোগ দেখা দিয়েছে, তার বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ। হেলেনের সঙ্গে তাই জেনের দেখাই হয়না। জেন একদিন শুনলো যে হেলেন আর বেশিদিন বাঁচবেনা। সেদিন অনেক রাত্রে জেন হেলেনের কাছে গেল। হেলেন জেনকে অনুরোধ করলো রাত্রিটা তার কাছে থাকতে। জেন আর হেলেন পাশাপাশি ঘুমিয়ে রইলো। পরদিন জেন জেগে দেখে সে তাদের শোবার ঘরে নার্সের কোলের মধ্যে রয়েছে। পরে মিস টেম্পলের কাছে সে শুনলো আগের দিন রাত্রেই হেলেন মারা গিয়েছে।

টাইফাস রোগের প্রাদুর্ভাবের পর কিভাবে অসুখটা ছড়ালো তার তদন্ত চলতে লাগলো। স্কুলের অব্যবস্থা সম্বন্ধেও নানা তথ্য তখন সবাই জানতে পারলো। ফলে অচিরেই জনমতের চাপে স্বাস্থ্যকর জায়গায় নতুন বাড়িতে স্কুলটি উঠে গেল। মেয়েদের খাওয়া দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদেরও উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হলো, এবং সর্বময় কর্তৃত্বের পদ থেকে মিঃ ব্রক্‌লহার্স্টকে সরানো হলো। নতুন কমিটি গঠিত হওয়ায় সবদিক দিয়ে স্কুলটি উন্নতির দিকে যেতে লাগলো।

এখানে ছ বছর শিক্ষাকাল শেষ করবার পর আরো ছু বছর শিক্ষিকার কাজে কাটলো জেনের। এই সময় মিস টেম্পল বিয়ে করে স্কুল ছেড়ে দিলেন। তিনি ছিলেন জেনের একাধারে মা, বন্ধু ও শিক্ষয়িত্রী। তিনি চলে যাওয়ার পর জেনের আর ওখানে থাকতে একটুও ভালো লাগলো না। কিন্তু কোথায় যাবে? কেমন করে? জেনের মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো—

"একদিন বিকেল বেলা আমার মনে হলো আট বছরের এই রুটিন বাঁধা জীবনে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মুক্তি চাই; আমি মুক্তি চাই। মুক্তির জন্য আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। মুক্তিলাভের জন্য আমি প্রার্থনা জানাতে লাগলাম; বাইরের মৃদু বাতাসে তা ছড়িয়ে গেল। তখন আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম এ অবস্থা থেকে যে কোনো পরিবর্তনের জন্য। তাও মিলিয়ে গেল মহাশূন্যে। 'তাহলে', প্রায় মরিয়া হয়ে আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'অন্তত নতুন কোনো একটা কাজ আমাকে দাও'।"

গৃহশিক্ষিকার কাজ তখনকার দিনে সুলভ ছিল। এই পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য গৃহশিক্ষিকার পদপ্রার্থী হয়ে জেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিল। পরের সপ্তাহে মিলকোটের (Millcote) কাছে থর্নফিল্ড (Thornfield) থেকে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স (Fairfax) বলে একটি মহিলা বিজ্ঞাপনের উত্তর দিলেন। দশ বছরের কম বয়সী একটি মেয়ের জন্য তিনি একজন গৃহশিক্ষিকা চান। জেনের খুব আনন্দ হলো। স্কুল কর্তৃপক্ষকে বললে তাঁরাই মিসেস রীডকে চিঠি দিলেন তাঁর এতে মত আছে কিনা জানবার জন্য। তিনি জবাব দিলেন জেন যা খুশি করতে পারে।

দিন পনেরো পরে জেনের নতুন কাজে যোগ দেবার কথা। কোনোদিন স্কুলের বাইরে পা বাড়ায়নি, তবু সাহসে ভর করে আঠারো বছর বয়সের জেন অজানা পথে পাড়ি দিল।

থর্নফিল্ডে পৌঁছে ছাত্রী অ্যাডেল ভারেনস্ (Adele Verens) ও তার অভিভাবিকা মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের সঙ্গে পরিচিত হয়ে

দুজনকেই জেনের খুব ভালো লাগলো। জেন শুনলো এই বাড়ির মালিক মিঃ রচেষ্টার অ্যাডেলের অভিভাবক। প্যারিস থেকে সম্পূর্ণ অসহায় মেয়েটিকে তিনি এনে প্রতিপালন করছেন। থর্নফিল্ডে এবং আশেপাশের প্রচুর জায়গা-জমির মালিক তিনি। খামখেয়ালী, মেজাজী লোক। বিয়ে থা করেননি, ঘুরে ঘুরে সারা বছর বেড়ান; বাড়িতে খুব কমই থাকেন, ইচ্ছামতো কিছুদিন কাটিয়ে যান। আপাতত মিঃ রচেষ্টার থর্নফিল্ডে নেই।

থর্নফিল্ডের বিরাট বাড়িটি চারিদিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রচুর ঘর কিন্তু অধিকাংশই শূন্য, তালা বন্ধ। দাসদাসী পরিজন ছাড়া আর কেউ থাকবার নেই। তারাও থাকে একটি নির্দিষ্ট দিকে। ঘর বাড়ি কিন্তু কেউ না থাকলেও রোজ ঝাড়াপোঁছা করা হয়। কারণ মিঃ রচেষ্টার পরিচ্ছন্ন তকতকে বাড়ি দেখতে চান। যে কোনো দিন, যে কোনো মুহূর্তে তিনি এসে পড়তে পারেন; আগে কিছুই জানান না।

মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে জেন বাড়িটা দেখলো। চারতলাটা যেন সব চাইতে নির্জন আর পরিত্যক্ত। ছাদ থেকে চারতলার বারান্দায় নামতেই কার যেন একটা তীক্ষ্ণ, অমানুষিক হাসির শব্দে নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে পড়লো। ভয়ে জেনের বুক কেঁপে উঠলো। কে হাসলো অমন করে? মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স বোঝালেন ভয়ের কোনো কারণ নেই। বাড়ির সব সেলাই ফোঁড়াই-এর কাজ যে করে সেই গ্রেসপুল (Grace Poole) নিশ্চয়ই অমনি করে হেসেছে। মধ্যবয়সী, লম্বা-চওড়া চেহারার গ্রেসপুলকে ডেকে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স সতর্ক করে দিলেন এমন গোলমাল আর যেন ভবিষ্যতে না হয়।

পরবর্তী চারমাস জেনের একই ভাবে থর্নফিল্ডের বাড়িতে কাটলো। অ্যাডেলের পড়াশোনা দেখা, মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের সঙ্গে কথা বলা আর একা একা ঘুরে বেড়ানো। চারতলার নির্জন বারান্দায় সে প্রায়ই পায়চারী করে বেড়ায়। আর মাঝে মাঝেই শুনতে পায়,

সেদিনের মতো উৎকট হাসি এবং গুনগুন কথার আওয়াজ। গ্রেস পুলের চেহারার সঙ্গে এই ধরণের হাসিকে জেন মেলাতে পারে না।

একদিন বিকেলে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্স একটি চিঠি জেনকে পোস্ট করবার জন্য দিলেন। দু মাইল দূরে ডাকবাক্স। পথের মাঝামাঝি ক্লান্ত হয়ে সে বিশ্রামের জন্য একটা টালির উপর বসলো। এমন সময় একটি বিরাট কুকুর দৌড়ে তার সামনে দিয়ে চলে গেল। দূরে যেন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, কে একজন ঘোড়ায় চড়ে সেখান দিয়ে চলে গেলেন। কুকুরটা আবার ডাকতে ডাকতে ফিরে এল। জেন একটা শব্দে ঘাড় ফেরাতেই নজরে পড়লো ঘোড়াশুদ্ধ সেই ভদ্র লোকটি বরফে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছেন। জেন সাহায্যের জন্য দৌড়ে গেল। প্রথমে তিনি সাহায্য নিতে রাজি হলেন না। পা মচকে যাওয়া সত্ত্বেও নিজেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে টালির উপর বসলেন। জেন লক্ষ করলো লোকটি অতিক্রান্তযৌবন; কিন্তু মধ্য বয়সে এখনো পৌঁছাননি। দোহারা চেহারা, রুক্ষ ও কঠিন। লোকটি তরুণ এবং সুন্দর দেখতে হলে জেন তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস কবতো না। এক্ষেত্রে কিছুটা লজ্জা ছাড়া তার মোটেই ভয় হলো না। ভদ্রলোকটি জানতে চাইলেন জেন ওখানে বসে ছিল কেন এবং সে কে?

"ঠিক ঐ নিচের দেয়াল-ঘেরা বাড়িতে তুমি থাকো?" আঙুল দিয়ে থর্নফিল্ডের বাড়ির দিকে নির্দেশ করলেন ভদ্রলোক।

"হ্যাঁ।"

"কার বাড়ি ওটা?"

"মিঃ রচেষ্টারের।"

"তুমি কি মিঃ রচেষ্টারকে চেনো?"

"না, আমি তাঁকে কখনো দেখিনি।"

"তিনি ওখানে থাকেন না?"

"না।"

"তিনি কোথায় বলতে পারো?"

"না, পারিনা।"

"তুমি ওখানে কি করো?"

"আমি গভর্নেস হয়ে এসেছি।"

"ও, গভর্নেস!"

একটু পরেই তিনি উঠে পড়লেন। ঘোড়ার পিঠে চড়ার সময় তিনি জেনের কাঁধে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে ঘোড়ায় উঠলেন। তারপর জেনকে চিঠি পোষ্ট করে তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। জেন বাড়ি ফিরে শুনলো মিঃ রচেষ্টার এসেছেন। অ্যাডেল আর মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের সঙ্গে খাবার ঘরে তিনি আছেন। ডাক্তার আনতে লোক গিয়েছে কারণ পড়ে গিয়ে তাঁর গোড়ালি মচকে গেছে।

পরদিন মিঃ রচেষ্টারের সঙ্গে জেনের পরিচয় হলো। অ্যাডেলের পড়াশুনার উন্নতির জন্য তিনি জেনকে প্রশংসা করলেন। কথায় কথায় জেনের সব কথা তিনি জেনে নিলেন। মিঃ রচেষ্টারের উপস্থিতি নিরানন্দ বাড়িতে প্রাণের সঞ্চার করেছে। জেনের সঙ্গে রোজ দেখা না হলেও সুযোগ পেলেই তিনি ডেকে তার সঙ্গে গল্প করেন। জেনকে তিনি বলেন মায়াবিনী, ছোট্ট পরী; প্রথম দিন যাদুমন্ত্রে সে তাঁকে ঘোড়াশুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল। ক্রমশ গল্পচ্ছলে তিনি জেনকে অনেক কথা বলতে লাগলেন। অ্যাডেল যে তাঁর অবৈধ সন্তান সে গোপন তথ্যও তিনি খুলে বল্লেন। মিঃ রচেষ্টারের বাইরের রূঢ়তা ও কঠিনতার আড়ালে আহত ক্ষতবিক্ষত একটি কোমল মনের দরজা জেনের কাছে খুলে গেল। ধীরে ধীরে জেন মিঃ রচেষ্টারের অনুরক্ত হয়ে পড়লো। এখন মিঃ রচেষ্টারের চলে যাবার কল্পনায় সে শিউরে ওঠে। নিঃসঙ্গ জীবনে আনন্দ এনেছেন তিনি, তিনি চলে গেলে দিন তার কি ভাবে কাটবে?

এই কথা ভেবে তার মনটা এত বিষণ্ণ ছিল যে সেদিন রাত্রে ভালো ঘুম হচ্ছিল না। হঠাৎ কানে এল বাইরে কার ফিসফিস

গলার আওয়াজ। কে যেন তার দরজার হাতল ধরে টানানানি করছে। জেন ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই সেই বীভৎস হাসি! "কে? কে ওখানে?" জেন বলে উঠলো। কোনো উত্তর নেই। শুধু একটা পায়ের শব্দ যেন চারতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। অজানা আশঙ্কায় জেন মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সকে ডাকবার জন্য দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। এত ধোঁয়া কেন? একটা মোমবাতি কেন বারান্দায় বসানো? ধোঁয়া যেন মিঃ রচেষ্টারের ঘর থেকেই বেরুচ্ছে। কি সর্বনাশ! জেন দৌড়ে সেই ঘরে গিয়ে দেখে বিছানার একপাশে রচেষ্টার ঘুমে অচেতন, আর তাঁর মশারি দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিছুতেই তাঁর ঘুম ভাঙাতে না পেরে জেন জল এনে বিছানায় ঢেলে দিতেই আগুন নিভলো, রচেষ্টারেরও ঘুম ভাঙলো। ব্যাপার শুনে তিনি জেনকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে চারতলায় উঠে গেলেন। ফিরে এলেন খুব গম্ভীর মুখে। বললেন, "ঠিক যা ভেবেছি তাই।" 'কি ভেবেছেন' জেনের এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না তিনি। "তুমি দরজা খুলে কাউকে দেখতে পেয়েছিলে?"

"না, শুধু মোমবাতিটা মেঝেয় বসানো ছিল।"

"কিন্তু অদ্ভুত একটা হাসি তুমি শুনেছ নিশ্চয়? এর আগেও তো এরকম হাসি তুমি শুনেছ?"

"তা শুনেছি। গ্রেসপুল নাকি ওভাবে হাসে। কী অদ্ভুত।"

"ঠিক তাই, গ্রেসপুলই। তুমি ঠিকই ধরেছ......।" জেনকে রচেষ্টার অনুরোধ করলেন এ ঘটনা আর কারো কাছে প্রকাশ না করতে। জেন ঘরে ফিরে যাবার সময় তিনি দুহাত দিয়ে তার হাত ধরে বললেন—"তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। তোমার কাছে আমি চিরঋণী......আর কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই।"

পরদিন আর মিঃ রচেষ্টারের দেখা মিললো না। শোনা গেল বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কিছুদিন কাটাতে তিনি অন্যত্র গিয়েছেন। সেখানে মিস্ ইনগ্রাম বলে রূপেগুণে অতুলনীয়া এক মহিলা

আছেন। তাঁর সঙ্গেই মিঃ রচেষ্টারের বেশি বন্ধুত্ব। তিনি প্রায়ই ওখানে যান, মিস্ ইনগ্রামও (Ingram) থর্নফিল্ডে আসেন।

নির্জন ঘরে মিথ্যা স্বপ্নজাল বোনার জন্য জেন নিজেকে ধিক্কার দিল। শ্রদ্ধার সঙ্গে তার মনে কখন অনুরাগ এসে ঠাঁই নিয়েছে বুঝতে পারেনি। মিঃ রচেষ্টার তাকে বন্ধু বলে মেনে নিয়েছেন সেইতো যথেষ্ট। তার চেয়ে বেশি আশা কি জেনের করা উচিৎ? সাধারণ রূপহীনা দরিদ্র গৃহশিক্ষিকা সে। রূপেগুণে চৌকশ মিস্ ইনগ্রামের সঙ্গে তার কি পাল্লা দেওয়া সাজে?

দিন পনেরো পরে দলবল নিয়ে মিঃ রচেষ্টার ফিরে এলেন। জানলা দিয়ে জেন ওদের দেখলো, কিন্তু সে যেমন পড়ার ঘরে অ্যাডেলকে নিয়ে ছিল তেমনি রইলো। পরদিন রচেষ্টারের আদেশে জেন রাত্রিতে খাবার পর অ্যাডেলকে ড্রইংরুমে নিয়ে গেল। সেখানে নানারকম হাসি ঠাট্টা গল্পগুজব চলছিল। মহিলারা কেউই জেনের দিকে নজর দিচ্ছিলেন না। জেন যথাসম্ভব নিজেকে সকলের আড়ালে রাখবার চেষ্টা করছিল। মিঃ রচেষ্টারও আর জেনের দিকে তাকাচ্ছেন না। ওদের সঙ্গে গল্পে মেতে রয়েছেন। এক সময়ে জেনের কানে এল মিস ইনগ্রাম অ্যাডেলকে বাড়িতে না রেখে স্কুলে রেখে পড়াবার কথা বলছেন মিঃ রচেষ্টারকে:

"কোত্থেকে এটিকে কুড়িয়ে এনেছ?...ওকে স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়াই তোমার উচিৎ।"

"সে সঙ্গতি আমার নেই, স্কুলের খরচ খুব বেশি।"

"কেন? গভর্নেস তো একজন রেখেছ দেখছি......ওকেও তো টাকা দিতে হয়। আমার তো মনে হয় এটাও খরচের ব্যাপার—আরো বেশি খরচ, কারণ দুজনের খাওয়ার জন্য তোমার বাড়তি টাকা খরচ করতে হয়।"

জেন ভাবলো তার প্রসঙ্গ ওঠায় মিঃ রচেষ্টার হয়তো তার দিকে একবার তাকাবেন। কিন্তু তিনি একবারও চোখ ফেরালেন না। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন—"ও বিষয়ে আমি কিছু ভাবিনি।"

"তোমাদের—পুরুষদের—টাকাপয়সা খরচের বিষয়ে একেবারে সাধারণ জ্ঞান পর্যন্ত নেই।...অন্তত এক ডজন গভর্নেস আমাদের ছিল, তার মধ্যে অর্ধেককে দেখলে ঘৃণা হতো, বাকিদের দেখলে হাসি পেতো।" এইভাবে কিছুক্ষণ গভর্নেসদের সম্পর্কে নিন্দা চললো। মিস ইনগ্রাম মন্তব্য করলেন গভর্নেসদের তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না, তারা এক একটি উৎপাত বিশেষ।

কিছুক্ষণ পর গানবাজনা শুরু হতেই জেন সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলো। ঘর থেকে বেরোতেই মিঃ রচেষ্টার এসে সামনে দাঁড়ালেন—

"আমাব সঙ্গে কথা বললে না যে?"

"আপনি ব্যস্ত ছিলেন তাই বিরক্ত করিনি।"

"...তোমাকে এমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?"

"কিছুই না।"

"...ড্রইংরুমে চলো, এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে কেন?"

"আমি আজ ক্লান্ত।"

এক মুহূর্ত জেনের দিকে তাকিয়ে মিঃ রচেষ্টার বললেন—"বিষণ্ণও দেখাচ্ছে তোমাকে। ব্যাপার কি, আমাকে বলো।"

"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, আমিতো বিষণ্ণ নই।"

"আমি বলছি তুমি বিষণ্ণ এবং এত যে আর দুয়েকটা কথা বললেই চোখে জল এসে যাবে।......ঠিক আছে, আজকের মতো যাও। কিন্তু কাল থেকে যে কদিন অতিথিরা থাকবেন ড্রইংরুমে তোমার নিয়মিত হাজিরা চাই।"

এইভাবে কয়েকদিন কাটলো। মিঃ রচেষ্টার যে মিস ইনগ্রামকেই বিয়ে করবেন সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। জেনের কিন্তু কয়েকদিন লক্ষ করে মনে হয়েছে দুজনের মধ্যে ঠিক প্রকৃত ভালোবাসা নেই। রচেষ্টার বিশেষ কোনো কারণে মিস ইনগ্রামকে বিয়ে করতে চান, ভালোবেসে নয়। মিস ইনগ্রামেরও আসল উদ্দেশ্য সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মানমর্যাদা লাভ করা।

একদিন বিশেষ কোনো কাজে মিঃ রচেষ্টার বাইরে গেলে মিঃ ম্যাসন (Mason) নামে একটি লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ থেকে সে এসেছে এবং সেখানেই রচেষ্টারের সঙ্গে তার পরিচয়। রচেষ্টার ফিরে জেনের কাছে খবর পেয়েই কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। মনে হলো যেন জোর আঘাত লেগেছে তাঁর। কেবলই বলতে লাগলেন, "আমার ছোট্ট বন্ধু জেন, যদি এমন একটা নির্জন দ্বীপে যেতে পারতাম যেখানে শুধু তুমি আছ আর কেউ নেই, তাহলে বোধহয় সব অশান্তির হাত এড়াতে পারতাম।"

"আমি কি করতে পারি বলুন। জীবন দিয়েও আমি আপনার কাজে লাগবো।"

"জেন, যদি আমার কোনো সাহায্য দরকার হয়, আমি তোমাকেই ডাকবো, কথা দিলাম।"

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে মিঃ রচেষ্টার ম্যাসনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

রাত্রিবেলা ভীষণ একটা চীৎকারে জেন চমকে উঠলো। তার ঘরের ঠিক উপরেই চারতলার ঘরে যেন একটা মারামারি, ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে। কে যেন আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো "বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও,...রচেষ্টার, রচেষ্টার, ঈশ্বরের দোহাই শিগগির এসো।" একটা দরজা খোলার শব্দ, কেউ যেন দৌড়ে গেল সেখান দিয়ে। উপরের ঘরে পায়ের শব্দ, কি যেন পড়ার শব্দ হলো, তারপর সব চুপ।

জেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গোলমাল শুনে বাড়ির সবাই ঘুম ভেঙে সেখানে জড়ো হয়েছে। কি হলো? কি ব্যাপার? কার লাগলো? ডাকাত নাকি? আলো, আলো, আমরা কি পালাবো? সবাই যে যার মতো বলতে থাকলো। অতিথিদের মধ্যে একজন বললো "কিন্তু রচেষ্টার কোথায়? তাকে তো বিছানায় পেলাম না?"

"এই যে, এই যে আমি। শান্ত হও সবাই, আমি আসছি।" মোমবাতি হাতে মি রচেষ্টার এসে দাঁড়ালেন। তিনি সবাইকে

বললেন, ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি। তোমরা নিশ্চিন্তে শুতে যেতে পারো। দাসীদের মধ্যে একজন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত। স্বপ্নের ঘোরে ভয় পেয়ে ঐভাবে চেঁচিয়ে উঠেছে। সবাই চলে যাবার বহুক্ষণ পরে জেনকে তার ঘর থেকে ডেকে আনলেন রচেষ্টার। জেন যেন বুঝেছিল তার ডাক আসবে, তাই সে তৈরিই ছিল। চারতলার একটি ঘরে জেনকে তিনি নিয়ে গেলেন। সে ঘরে পর্দার আড়ালে ঢাকা আরেকটি ছোট ঘর, দরজা খোলা। ঘরের ভিতরের আলো খোলা-দরজা দিয়ে এঘরে এসে পড়ছে। সেই ঘরে কুকুরের ঝগড়া মারামারির মতো শব্দ ও ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যাচ্ছে। জেনকে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে বলে রচেষ্টার সেই ছোট ঘরের ভিতরে ঢুকে গেলেন। ঢুকতেই তিনি বিকট হাসির সম্বর্ধনা পেলেন—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ; ঠিক গ্রেসপুলের হাসির মতো। মিঃ রচেষ্টার কোনো কথা না বলে কিছু একটা ব্যবস্থা বোধহয় সেখানে করলেন। তাঁকে উদ্দেশ্য করে মৃদু কণ্ঠে কেউ কিছু বললো। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

"জেন, এদিকে এসো।" ঘরের আরেক প্রান্তে বিছানার উপর এলিয়ে পড়ে মিঃ ম্যাসন, সারা শরীর রক্তাক্ত। জেনকে তার কাছে রেখে মিঃ রচেষ্টার চুপি চুপি ডাক্তার ডেকে আনতে গেলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলে তেমনি চুপি চুপি মিঃ ম্যাসনকে সূর্যোদয়ের আগেই বাড়ির বার করে দেওয়া হলো। থর্নফিল্ডের বাড়ির অনেক কিছুই জেনের কাছে রহস্যাবৃত। আজকের ঘটনাও তার মনে অনেক প্রশ্ন তুললো কিন্তু মুখ ফুটে সে কিছুই জানতে চাইলো না। শুধু জিজ্ঞাসা করলো—"গ্রেসপুল কি এর পরও এখানে থাকবে?"

"নিশ্চয়ই থাকবে। ওকে নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না…।"

"কিন্তু ও থাকলে যে কোনো মুহূর্তে আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে।"

"সে ভয় কোরোনা। আমি সতর্ক থাকবো।"

মিঃ রচেষ্টার জেনকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলে স্বীকার করে নিলেন। বললেন, "আজ সারারাত তুমি আমার সঙ্গে জেগে রইলে। আবার কবে এভাবে জাগবে?"

"যখনি আপনার প্রয়োজন হবে।"

"আমার বিয়ের আগের রাত্রে? সে রাত্রে আমার তো ঘুম হবেনা। তুমি কথা দাও সেই রাত্রে তুমি আমাকে সঙ্গ দেবে। তোমার কাছে প্রাণ খুলে আমি আমার প্রিয়তমার গল্প করতে পারবো কারণ তুমি তাকে দেখেছ, তাকে জানো।"

"আচ্ছা থাকবো।"

পরদিন গেটস্‌হেড থেকে খবর এল মিসেস রীড মৃত্যুশয্যায়। জেনকে তিনি দেখতে চান। মিঃ রচেষ্টারের কাছে ছুটি নিয়ে জেন সেখানে গেল। মৃত্যুর আগে মিসেস রীড তাকে একটা চিঠি দিলেন। চিঠিটা জেনের কাকার। তিনি ওয়েস্ট-ইণ্ডিজে থাকেন। তাঁর সন্তানাদি নেই বলে জেনকে সব কিছু দিয়ে যাবেন মনস্থ করে মিসেস রীডের কাছে জেনের ঠিকানা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন তিনি।

একমাস বাদে, মিসেস রীডের মৃত্যুর পর, জেন থর্নফিল্ডে ফিরে এল। ইতিমধ্যে মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সের চিঠিতে সে জেনেছে যে মিঃ রচেষ্টারের বিয়ে আসন্ন। সেই সব ব্যবস্থা করতে আর নতুন একটা গাড়ি কিনতে তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন। জেন ভাবলো এবার বিদায় নিতে হবে। মিঃ রচেষ্টারের বিয়ের পর কিছুতেই এখানে থাকা চলবেনা। অন্যত্র চাকরি খুঁজতে হবে। থর্নফিল্ডের বাড়ি ছেড়ে যাবার চিন্তায় তার মন বিষণ্ণ হয়ে পড়লো।

বাড়ি ঢুকবার মুখেই দেখা হলো মিঃ রচেষ্টারের সাথে। তাঁর সঙ্গে কথায় কথায় জেন স্বীকার করলো থর্নফিল্ডকেই সে নিজের বাড়ি মনে করে। যেখানে রচেষ্টার আছেন সেখানেই তার বাড়ি।

রচেষ্টার তাকে নতুন গাড়ি দেখালেন। জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস রচেষ্টারের উপযুক্ত কিনা গাড়িটা। আরো বললেন—"জেন তুমি

পরী, যাত্নমন্ত্র জানো। কোনো মন্ত্রে আমাকে সুন্দর করে দিতে পারো?"

"সে জন্য কোনো যাত্নমন্ত্রের দরকার হয়না। ভালোবাসার চোখই সে যাত্নমন্ত্র। সে রকম চোখের কাছে আপনি অপূর্ব সুন্দর।"

তারপর প্রায় দুসপ্তাহ কাটলো, কিন্তু বিয়ের আর কোনো আয়োজনের আভাস জেনের চোখে পড়লো না। মিস ইন-গ্রামের সঙ্গেও রচেষ্টার আর দেখা করতে গেলেন না বা তিনিও এলেন না।

একদিন সন্ধ্যায় বাগানে ঘুরতে ঘুরতে মিঃ রচেষ্টারের সঙ্গে জেনের দেখা।

"জেন গ্রীষ্মকালে থর্নফিল্ড বড় সুন্দর, না?"

"হ্যাঁ।"

"এ বাড়ির উপর তোমার একটা টান জন্মেছে, তাই না?"

"হ্যাঁ, আমি একে খুব ভালোবাসি।"

"...তাহলে সবাইকে ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে?"

"হ্যাঁ।"

"দুর্ভাগ্য!" নিঃশ্বাস ফেলে রচেষ্টার বললেন, "জীবনে এই রকমই ঘটে। যখন তুমি বেশ গুছিয়ে সুন্দর একটা জায়গায় বিশ্রামের জন্য বসেছ তখনি তলব আসে আবার উঠে চলবার।"

"আমাকে কি যেতেই হবে? থর্নফিল্ড ছাড়তেই হবে?"

"হ্যাঁ, ছাড়তেই হবে। আমি খুবই দুঃখিত, জেন। কিন্তু আমার মনে হয় এটা প্রয়োজন।"

"বেশ তাই হবে। হুকুম পেলেই আমি তৈরি থাকবো।"

"আজ রাত্রেই আমি সে হুকুম দিচ্ছি।"

"তাহলে আপনি বিয়ে করছেন?"

"ঠিক বলেছ, তুমি বুদ্ধিমতী, ঠিক জায়গায় ঘা দিয়েছ।"

"বিয়ে কি খুবই শিগগির?"

"খুব শিগগির……তুমিইতো আগে বলেছিলে,—তোমার বিবেচনা আর দূরদর্শিতার আমি প্রশংসা করি,—বলেছিলে আমার বিয়ের আগে তুমি আর অ্যাডেল চলে যাবে।……অ্যাডেলকে আমি স্কুলে পাঠাচ্ছি, আর তোমাকে এবার নতুন কাজ খুঁজে নিতে হবে।"

"অবিলম্বে আমি বিজ্ঞাপন দেবো…।"

"একমাসের মধ্যেই আমি বিয়ে করছি আর এই সময়ের মধ্যে আমি নিজেই তোমার জন্য খোঁজ করবো।"

আয়ার্ল্যাণ্ডে একটি পরিবারে পাঁচটি মেয়ের জন্য গৃহশিক্ষিকা চায়। সেইটির জন্য রচেষ্টার চেষ্টা করবেন বললেন।

"সে যে অনেক দূর।"

"তাতে কি? তোমাব মতো মেয়ের পক্ষে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া বা দূরত্বের জন্য আপত্তি করা সাজেনা।"

"সমুদ্র পাড়িব কথা নয়, দূরত্বের কথা বলছি। আর সমুদ্রও তো একটা বাধা—"

"কিসের থেকে?"

"ইংলণ্ড থেকে, থর্নফিল্ড থেকে, আর—"

"আর কি?"

"আপনার কাছ থেকে।"

ঝরঝর করে জেনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। পাছে রচেষ্টার শুনতে পান, প্রাণপণ চেষ্টায় সে উচ্ছ্বসিত কান্না দমন করতে লাগলো।

মিঃ রচেষ্টার বলতে লাগলেন—"সত্যিই খুব দূরের পথ আয়ার্ল্যাণ্ড। আমার ছোট্ট বন্ধুকে অতদূর পাঠাতে হচ্ছে বলে আমি খুবই দুঃখিত……আচ্ছা জেন, আমার সঙ্গে কোনো কিছুতে তোমার মিল আছে বলে তোমার মনে হয়?"

জেনের মন উদ্বেলিত। কথা বলার সাহস তার হলো না। রচেষ্টার বলতে লাগলেন—"কারণ সময়ে সময়ে তোমার সম্পর্কে আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়; বিশেষত তুমি যখন কাছে থাকো, এখন

যেমন রয়েছ। মনে হয় দারুণ শক্ত একটা সূতো দৃঢ়ভাবে বাঁধা আছে আমার ডান পাঁজরে আর তোমার ছোট্ট পাঁজরে। যদি ছুশো মাইল দূরত্ব এবং দুরন্ত সমুদ্রের বাধা আমাদের মধ্যে আসে, তবে হয়তো ঐ সূতো ছিঁড়ে যাবে। আমার কেমন ভয় হয়, হয়তো তাহলে আমার ভিতরে রক্তক্ষরণ হতে থাকবে। আর তুমি—তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাবে।"

"কোনোদিনই তা সম্ভব নয়।"

"জেন, শুনতে পাচ্ছো নাইটিংগেল পাখি গান গাইছে, শোনো।"

জেন কান্নায় এবার ভেঙে পড়লো। সে শুধু এই টুকুই বলতে পারলো কেন সে জন্মেছিল, কেন সে থর্নফিল্ডে এসেছিল।

"থর্নফিল্ড ছাড়তে কষ্ট পাচ্ছো বলে বলছো?"

"হ্যাঁ থর্নফিল্ড ছাড়তে কষ্ট……থর্নফিল্ডকে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি, তার কারণ এখানে আমি পরিপূর্ণ জীবনের আনন্দ নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। এখানে আমাকে কেউ দাবিয়ে রাখেনি; এখানে আমি নিশ্চল পাথরে পরিণত হইনি।…যা উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, মহৎ তাঁর সাক্ষাৎ থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করেনি। যাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি, যাঁর সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয় সেই তুলনাবিহীন, তেজোদৃপ্ত, মহান পুরুষের মুখোমুখি আমি কথা বলতে পারছি। মিঃ রচেষ্টার, আপনাকে আমি জেনেছি। আপনার কাছ থেকে চিরবিদায় নেওয়ার চিন্তা আমার কাছে দুঃসহ। জানি চলে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু তা হবে মৃত্যুর মতোই মর্মান্তিক।"

"প্রয়োজনটা কোথায়?"

"কোথায়? আপনিই তো প্রয়োজন আমার চোখের সামনে রেখেছেন।"

"কেমন করে?"

"আপনার সুন্দরী স্ত্রী—মিস ইনগ্রামকে এনে।"

"আমার স্ত্রী? কোন্ স্ত্রী? আমার তো স্ত্রী নেই।"

"কিন্তু হবে তো?"

"ও, হ্যাঁ, হবে, হবে!"

আকস্মিকভাবে মিঃ রচেষ্টার জেনকে আরো কিছুদিন থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

জেনের অহঙ্কারে আঘাত লাগলো। অবরুদ্ধ অথচ দৃপ্তস্বরে সে বলতে লাগলো—"আমি কিছুতেই থাকবো না। কেন থাকবো? আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবেনা অথচ আমি থাকবো? এ হয়না। আমি কি একটা যন্ত্র? কোনো অনুভূতি নেই?......হতে পারি আমি অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অতি সাধারণ, রূপগুণহীন, কিন্তু আমারও আপনার মতোই মন আছে, ভালোবাসবার ক্ষমতা আছে। আমার যদি রূপ থাকতো, অর্থ থাকতো, তবে এ ভাবে আমাকে ঠেলে দিতে পারতেন কি?"

মিঃ রচেষ্টার দুই হাতে জেনকে জড়িয়ে ধরলেন। ছটফট করে সরে গেল জেন।

"জেন আমার কাছে এসো।"

"না, যাবোনা—দূরে সরে এসেছি; আর ফেরা যায় না।"

"কিন্তু জেন, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হতে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি যাকে বিয়ে করতে চাই সে তুমি।"

রচেষ্টার কি বিদ্রূপ করছেন? জেন চুপ করে রইলো।

"এসো জেন, কাছে এসো।"

"আপনার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের মাঝখানে।"

মিঃ রচেষ্টার উঠে এলেন জেনের কাছে। জেনকে কাছে টেনে বললেন, "এইতো আমার স্ত্রী, আমার দ্বিতীয় সত্তা—জেন, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?"

জেন তবু নিরুত্তর।

"আমাকে তুমি বিশ্বাস করছ না? তোমার চোখে কি আমি মিথ্যাবাদী?......মিস ইনগ্রামের প্রতি আমার ভালোবাসা কতটুকু? একটুও নয়। সে তুমি জানো। আমার প্রতি তার ভালোবাসা? কিছুই না।......তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। গুজব রটিয়েছিলাম যে

আমার ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে লোকের যা ধারণা, তার এক তৃতীয়াংশও আমার নেই। ফলে সঙ্গে সঙ্গে সে সরে দাঁড়িয়েছে। তাকে আমি বিয়ে করবো? কখনোই না। আর তুমি? তুমি আশ্চর্য, যেন এই পৃথিবীরই নও তুমি। তোমাকে আমি একেবারে নিজের মতো করে ভালোবাসি। তুমি দরিদ্র, অখ্যাত, ছোট্ট, সাধারণ—সেই তোমাকেই আমি আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে মিনতি করছি।"

এতখানি আন্তরিক ভালোবাসা কি জেন অগ্রাহ্য করতে পারে?

বিয়ের আয়োজন সমাপ্ত প্রায়। বিয়ের ঠিক পরই ওরা থর্নফিল্ড ছেড়ে লণ্ডনে যাবেন, তারপর ঘুরবেন য়ুরোপের দেশে দেশে। সেইভাবে গোছগাছ চলছিল। নির্দিষ্ট দিনের দুদিন আগে বৈষয়িক কাজ উপলক্ষে রচেস্টারকে বাইরে যেতে হলো। পরদিন তিনি ফিরে আসবেন। জেনের জন্য বিয়ের পোষাক,অবগুণ্ঠন সেইদিনই তৈরি হয়ে এল।

রাত্রে জেনের মনে কিসের যেন আশঙ্কা। অনেক চেষ্টায়ও ঘুম আসতে চায় না। একটু তন্দ্রা আসতেই বারবার দুঃস্বপ্নের বিভীষিকায় ঘুম ভেঙে যায়। এইভাবে একবার ঘুম ভাঙতেই মনে হলো বুঝি ভোর হয়েছে, ঘরে যেন আলো দেখা যাচ্ছে। ভালো করে চাইতেই দেখে দিনের আলো নয়, মোমবাতির আলো পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের উপর, পোষাক রাখবার আলমারির উপর। একটি মূর্তি আলমারি খুলে সামনেই ঝুলিয়ে রাখা বিয়ের পোষাক আর অবগুণ্ঠন মনোযোগ দিয়ে দেখছে। কে ও? কোনো দাসী কি? বিছানায় উঠে বসে ঝুঁকে পড়ে জেন দেখতে চেষ্টা করলো কে ওখানে। কাউকে চিনতে পারে কিনা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলো এ চেহারা সে কোনো দিনও দেখেনি। খুব বড়সড় লম্বা; ঘন কালো চুল পিঠের উপর খোলা, পরনে সাদা লম্বা কি একটা জড়ানো। অবগুণ্ঠনটি হাতে নিয়ে মূর্তিটি আয়নার সামনে গিয়ে মাথায় দিয়ে দেখতে লাগলো। আয়নার ভিতরে তার মুখের চেহারা দেখে জেনের হৃৎকম্প উপস্থিত হলো। মরার মতো বীভৎস

ফ্যাকাশে মুখ, লাল চোখ, চোখের নীচটা কালো; ঠোঁঠ বিশ্রী রকম ফোলা আর কালো। ভুরু কোঁচকানো, কপালের উপর তোলা। ঠিক যেন একটি রক্তচোষা বাদুড়। মূর্তিটি মাথার উপর থেকে অবগুণ্ঠনটি নিয়ে দু টুকরো করে ছিঁড়ে মেঝেয় ফেলে দু পায়ে মাড়াতে লাগলো। তারপর জানলার পর্দা সরিয়ে ভোর হচ্ছে দেখে মোমবাতি নিয়ে সে দরজার দিকে অগ্রসর হলো। জেনের বিছানার কাছে এসে, মোমবাতিটা একেবারে মুখের সামনে ধরে ঝুঁকে পড়ে সে জেনকে দেখতে লাগলো। হঠাৎ এক ফুঁয়ে জেনের চোখের সামনেই বাতিটা সে নিভিয়ে দিল। ভয়ে আড়ষ্ট জেন এবার একেবারে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো। যখন জ্ঞান হলো, দিনের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল। প্রথমে জেন ভাবলো এও বুঝি একটা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু তা যে নয় তার প্রমাণ ছেঁড়া অবগুণ্ঠনটি পড়ে রয়েছে মেঝেয়, কার্পেটের উপর।

সারাদিন দুঃসহ প্রতীক্ষায় কাটিয়ে সন্ধ্যার পর মিঃ রচেষ্টার ফিরলে জেন সব কথা খুলে বললো। রচেষ্টার বললেন কেউ যে ঘরে এসেছিল সেটা নিশ্চিত। বাকিটা জেনের ভয়প্রসূত কল্পনা। যে ঢুকেছিল সে গ্রেসপুল ছাড়া আর কেউ না। প্রথম থেকেই তো জেনের কাছে গ্রেসপুলের আচরণ রহস্যাবৃত। তাছাড়া মিঃ রচেষ্টার আর মিঃ ম্যাসনকে যে সে মেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল তাওতো জেনের প্রত্যক্ষ দেখা। নিশ্চয়ই ঘুমের ঘোরে গ্রেসপুলকেই জেন অশরীরী কেউ মনে করেছে। গ্রেসপুল যে ধরনের তাতে পোষাক ছেঁড়া তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়।

জেন জানতে চাইলো এধরনের স্ত্রীলোককে রচেষ্টার কেন বাড়িতে রেখেছেন। এর উত্তর তিনি বিয়ের এক বছর বাদে দেবেন বললেন। জেনকে সে রাত্রে অ্যাডেলের ঘরে খিল বন্ধ করে শোবার নির্দেশ দিলেন মিঃ রচেষ্টার।

পরদিন অনাড়ম্বর ভাবে বিবাহ অনুষ্ঠান। সুসজ্জিতা জেনকে নিয়ে রচেষ্টার গির্জা অভিমুখে রওনা দিলেন। পাদ্রী অনুষ্ঠানের

প্রথম পর্ব আরম্ভ করবার মুহূর্তে হঠাৎ একটি গলা শোনা গেল—"এ বিয়ে হতে পারে না। বাধা আছে। এর প্রমাণও আমি দাখিল করতে পারি।"

"কি জাতীয় বাধা?" পাদ্রী জানতে চাইলেন।

লোকটি এগিয়ে এসে বললো "বাধা রচেষ্টারের আগের বিয়ে। তাঁর স্ত্রী জীবিত।"

জেনের সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো, শরীরে যেন আগুনের স্রোত বইছে। সে কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে? না, তাকে শক্ত হতে হবে। রচেষ্টারের মুখের দিকে সে চাইলো। তাঁর মুখ পাথরের মতো কঠিন, চোখে যেন আগুনের ফুলকি। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন "কে আপনি?"

"আমার নাম ব্রিগস্ (Briggs), লণ্ডনের একজন উকীল।"

"আমার স্ত্রীকে বর্ণনা করতে পারবেন? তার নাম, ধাম, পরিচয়?"

"নিশ্চয়ই।" মিঃ ব্রিগস পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে পড়তে লাগলো—

আমি নিশ্চিত বলছি এবং প্রমাণ করতে পারি যে ২০শে অক্টোবর—(১৫ বছর আগের তারিখ) থর্নফিল্ড হলের এডওয়ার্ড ফেয়ারফ্যাক্স রচেষ্টারের সঙ্গে আমার ভগ্নী (জোনাস ম্যাসন এবং অ্যাণ্টোয়নেটা ম্যাসনের কন্যা) বার্থা অ্যাণ্টোয়নেটা ম্যাসনের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে জামাইকার গির্জায়। বিয়ের দলিল গির্জার রেজিষ্ট্রারের কাছে পাওয়া যাবে। তার নকল আমার কাছে আছে।

স্বাঃ রিচার্ড ম্যাসন

"বেশ ধরলাম প্রকৃত দলিল পাওয়া গেল, প্রমাণিত হলো আমি বিবাহিত কিন্তু স্ত্রী এখনো জীবিত আছেন তার প্রমাণ কি?"

"তিনমাস আগেও জীবিত ছিলেন।"

"কি ভাবে জানা গেল?"

"তার এমন সাক্ষী আছে যে তাকে খণ্ডন করা শক্ত।"

"বেশ, তাকে নিয়ে আসুন।"

মিঃ ম্যাসন সামনে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে মনে হলো ভয়ে সে রীতিমতো কাঁপছে। তবু অনেক চেষ্টায় সে বললো :

"সে এখন থর্নফিল্ড হলে আছে। গত এপ্রিলে আমি তাকে সেখানে দেখেছি। সে আমাব বোন।"

অদ্ভুত হাসি দেখা দিল রচেষ্টারের মুখে। ম্যাসনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ কবে সমবেত জনতার উদ্দেশে তিনি বলতে লাগলেন :

"এক স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ কবা খুবই জঘন্য। সেই জঘন্য কাজই আমি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঈশ্বর তা করতে দিলেন না। আপনাদেব চোখে আমি একটি শয়তান ছাড়া আর কিছু নই এখন।......আমাব সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। এই উকীলটি আর তার মক্কেল যা বললো সব সত্যি। আমি বিবাহিত এবং আমার স্ত্রী জীবিত। আপনারা মিসেস রচেষ্টারের কোনো অস্তিত্ব থর্নফিল্ডে আছে বলে জানেন না। কিন্তু কোনো একটি উন্মাদ নারীকে নাকি দিনরাত কড়া পাহারায় রাখা হয়েছে সেই কানাঘুষা আপনাদের কানে নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। কেউ কেউ বলা-বলি করেছে সে আমার অবৈধ বোন, কেউ কেউ বলেছে পরিত্যক্ত রক্ষিতা। আজ আমি আপনাদেব বলছি সেই নারী আমাব স্ত্রী, পনেবো বছব আগে যাকে আমি বিয়ে কবেছিলাম। তাব নাম বার্থা ম্যাসন—ঐ যে ভীরু কাপুরুষ লোকটা—ওর বোন। বার্থা ম্যাসন উন্মাদ। তিন পুরুষ ধবে যে পরিবার জড়বুদ্ধি আর উন্মাদ, সেই বংশের মেয়ে। বার্থার মা ছিলেন ঘোর উন্মাদ। সব কিছু লুকিয়ে ওরা বিয়ে দিয়েছিল। তারপর আমার সে কি দারুণ অভিজ্ঞতা—যাক আমার আর কিছু বলবার দরকার নেই। আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, গ্রেসপুলের পাহারায় আমার স্ত্রীকে আপনারা দেখবেন। দেখে বিচার করবেন আমি প্রতারক কিনা, বিয়ের চুক্তি ভঙ্গ করার আমার অধিকার আছে কিনা। আর এই মেয়েটি,

জেনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—"আপনাদেব মতোই এসব কিছুই জানতো না। ও ভেবেছিল সব কিছু ঠিক আছে এবং আইন সম্মত হচ্ছে। স্বপ্নেও ভাবেনি যে এমন একজন হতভাগা জালিয়াতেব সঙ্গে ও জড়িত হচ্ছে যার জীবনসঙ্গিনী একজন উন্মাদ, যাকে পশু বললেও চলে"

দৃঢ় মুষ্টিতে জেনের হাত ধরে মিঃ রচেষ্টার গির্জা থেকে বেরিয়ে এলেন। অন্য সবাই তাঁকে অনুসরণ কবলো। বাড়ি পৌঁছে চার-তলাব ঘবে সবাই এলেন। পর্দা ঢাকা ছোট ঘবটি চাবি দিয়ে খুলে সকলকে ডাকলেন। ঘরটিতে জানলা নেই। ছাদ থেকে একটা বাতি ঝুলছে। গ্রেসপুল আগুনের কাছে বসে কি যেন রান্না কবছে। ঘরের একপ্রান্তে অন্ধকাবেব মধ্যে একটি মূর্তি এ পাশ থেকে ও পাশে ছুটোছুটি করছে। মূর্তিটি মানুষ না পশু এক নজরে চট কবে বলা কঠিন; হামাগুড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে নিচু হয়ে যাচ্ছে, কখনো বুনো পশুব মতো গর্জন কবতে কবতে আক্রমণ কবতে আসছে। শরীবে আবরণ একটা আছে। কালো জট পাকানো চুলে মুখ মাথা সব ঢাকা।

মিঃ রচেষ্টার গ্রেসপুলকে দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করার পর মুহূর্তেই বিকট একটা চীৎকার কবে মূর্তিটি উঠে দাঁড়ালো। চোখ-মুখ থেকে চুলেব গোছা সরিয়ে সবাব দিকে কটমট করে তাকালো। "সবাই সরে যান। হাতে ছুরি নেই তো? আমি সতর্ক আছি।" এক ধাক্কায় মিঃ রচেষ্টার তাকে সরিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ উন্মাদ নারী ছুটে এল রচেষ্টারের দিকে। তিনি জেনকে পিছনের দিকে ঠেলে দিতে না দিতেই উন্মাদিনী রচেষ্টারের গলা দুহাতে টিপে ধরে তাঁর গাল কামড়ে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা কবতে লাগলো। বহুকষ্টে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। আবার চাবি বন্ধ করে সবাইকে নিয়ে রচেষ্টার বেরিয়ে এলেন।

থর্নফিল্ড ছেড়ে যেতে হবে, মিঃ রচেষ্টারকে ছেড়ে যেতে হবে। জেনেব মনে সঙ্কল্প এবার দৃঢ়। যত আঘাত লাগুক না কেন, ক্ষত

মুখে যত রক্তই ঝরুক না কেন যেতে তাকে হবেই। মিঃ রচেষ্টারের করুণ মিনতি, তাঁর প্রেমের উচ্ছ্বাস কোনো কিছুই তার সংকল্পকে আর টলাতে পারলো না। মিঃ রচেষ্টার অপরাধ স্বীকার করে বারবার ক্ষমা চাইলেন। অর্থলোভী বাবার ষড়যন্ত্রে এই বিয়ে তাঁর জীবনে যে অশান্তি এনেছে তারি জ্বালায় ছটফট করে তিনি মুক্তির আলো খুঁজছিলেন। জেনের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর আত্মার সঙ্গিনী। ছোট্ট জেন যেন পরীরাজ্য থেকে নেমে এসে তাঁর অন্তর-বাহির অপূর্ব আনন্দে ভরে দিয়েছে। স্ত্রীর কথা প্রথম থেকেই গোপন করেছিলেন তিনি, জেন ভয় পাবে বলে। জেন থর্নাফিল্ডে আসবার আগেই সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এটা গোপন রাখতে। এখন তিনি চান থর্নাফিল্ড থেকে বহু দূরে যেতে, যেখানে কেউ তাঁকে চিনবেনা, জানবেনা। নতুন নামে, নতুন পরিচয়ে তিনি জেনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে থাকবেন। কিন্তু জেন তাতে রাজি নয়। বিবাহ বন্ধন ছাড়া সে কিছুতেই রচেষ্টারের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না। অনেক চেষ্টা করে রচেষ্টার তখনকার মতো হাল ছেড়ে দিয়ে জেনকে ভালো করে ভেবে দেখতে বললেন। জেনই তাঁব জীবন, তাঁর আশা, তাঁর ভালোবাসা। সেই জেনকে ছেড়ে তিনি কি করে বেঁচে থাকবেন? জেন রচেষ্টারকে অন্তর থেকে ক্ষমা করেছে, কিন্তু রচেষ্টারের কাছে থাকা ওর পক্ষে এখন অসম্ভব। হয়তো কোনো দুর্বল মুহূর্ত নীতিবোধকে ছাপিয়ে উঠবে। অতএব জেন আবার পা বাড়ালো অজানা পথে।

রাত্রির অন্ধকারে নীরবে মিঃ রচেষ্টারকে দূর থেকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গোপনে জেন থর্নাফিল্ডের :বাড়ি ছাড়লো। কোথায় যাবে, কোনদিকে যাবে কিছুই ঠিক নেই। একটা ঝোপের কাছে বসে ভাবছে এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শুনতে পেল। গাড়োয়ানকে তার কাছে যা পয়সা ছিল দিয়ে ঐ পয়সায় যতদুর যাওয়া যায় তাকে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলো। গাড়োয়ান তাকে হোয়াইট ক্রস (White Cross) বলে একটা জায়গায় নামিয়ে দিল। পাথরের

খোদাই করা পথনির্দেশ দেখে জেন জানলো সব চাইতে কাছের শহরের দূরত্ব দশ মাইল। হাঁটতে হাঁটতে জেন পৌঁছলো একটা গ্রামে। হাতে একটা পয়সাও নেই যে কিছু কিনে খায়। একটা দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো কোথাও তার উপযোগী কোনো কাজ খালি আছে কিনা। কিন্তু নিরাশ হতে হলো।

খিদেয় পেট জ্বলছে, কিন্তু কেমন করে লোকের কাছে খাবার চেয়ে খাবে? যদি কোনো সাহায্য বা পরামর্শ দিতে পারেন এই ভেবে জেন গির্জার পাদ্রীর খোঁজে গিয়েও হতাশ হলো। পাদ্রী তখন সেখানে ছিলেন না।

পথশ্রমে, খিদেয় শ্রান্ত ক্লান্ত জেনের প্রায় সংজ্ঞা হারানোর মতো অবস্থা। একজন চাষী দয়া করে একটুকরো রুটি দিয়েছিল। সেটুকু ছাড়া আর কিছুই এ পর্যন্ত জোটেনি। রাত্রিবেলা খোলা মাঠের মধ্যে শোওয়া ছাড়া কোথাও আশ্রয় নেই। জেন ভাবলো এবারে তার মৃত্যু আসন্ন। গ্রামের পথ ছেড়ে সে তখন মাঠের পথ ধরলো। এই মাঠেই সে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পড়ে থাকবে। চলবার মতো শক্তি তার আর এতটুকুও নেই। হঠাৎ চোখে পড়লো দূরে যেন কোনো বাড়িতে আলো দেখা যাচ্ছে। অতিকষ্টে জেন সে পর্যন্ত নিজেকে টেনে নিয়ে গেল। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে কিছুক্ষণ দেখে সে বুঝলো ঘরের ভিতর যারা আছে তারা দুই বোন ডায়না (Diana) এবং মেরী (Mary) । তারা জার্মান পড়ছে আর তাদের পুরোনো দাসী হানা (Hannah) সেখানে বসে বুনছে।

মরিয়া হয়ে জেন দরজায় ঘা দিল। কিন্তু ভিখারী মেয়ে ভেবে হানা তাকে ঢুকতে দিল না। জেনের তখন আর চলবার ক্ষমতা নেই। সে তখন দুর্বলতা ও ক্লান্তির চরম সীমায়। দরজার গোড়াতেই সে শুয়ে পড়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। অস্ফুট গলায় সে বলতে লাগলো—"এবার আমি মরবোই। ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি তারি জন্য নীরবে প্রতীক্ষা করবো।"

জেনের খুব কাছ থেকে কে যেন বলে উঠলো, "মানুষ মাত্রেই মরবে। কিন্তু কেউই অকালে মরবে না যদি না তোমার মতো অবস্থায় পড়ে।"

"কে কথা বললো?"

কোনো উত্তর না দিয়ে কে যেন সজোরে দরজায় ঘা দিল।

হানা বেরিয়ে এসে বললো "মিঃ সেণ্টজন? একি? ভিখারী মেয়েটা এখনো যায়নি? এই ওঠ, ওঠ্ বলছি, এক্ষুণি চলে যা এখান থেকে।"

"হানা, চুপ করো। একে তাড়িয়ে দিয়ে তুমি তোমার কর্তব্য করেছ, আমি আমার কর্তব্য করবো একে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে।"

অবশেষে জেন আশ্রয় পেল। তিনচারদিন প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় কাটবার পর সে কিছুটা সুস্থ হলো। হানার কাছ থেকে সে জানলো এঁরা রিভার্স (Rivers) পরিবার, বংশানুক্রমে মার্শএণ্ডের (Marsh End) বাড়িতে এঁরা আছেন। এ বংশে এখন মাত্র তিনজন আছেন—সেণ্টজন এবং তার দুই বোন। সেণ্টজন মর্টন গ্রামের পাদ্রী।

ডায়না এবং মেরী দুজনেই গভর্নেস। ছুটিতে তারা বাড়ি আসে। জেনের চাইতে ওদের পড়াশুনা বেশি। জেন অনেক কিছু শিখতে পারে ওদের কাছ থেকে। সেণ্টজন রিভার্স জেনের পরিচয় জানতে চাইলে জেন সংক্ষেপে তার অতীত জীবনের কথা বললো। নিজের প্রকৃত নাম না বলে 'জেন এলিয়ট' এই নামটি ব্যবহার করলো। মিঃ রচেষ্টারের প্রসঙ্গ জেন অবশ্যই একেবারে চেপে গেল।

ডায়না এবং মেরী যতদিন ছিল দিনগুলো বেশ আনন্দে কাট-ছিল। যখন কিছুদিন পরে ওরা দুজনে গভর্নেসের কাজে ফিরে গেল তখন জেনের খুব খারাপ লাগতে লাগলো। এদের আশ্রয়ে আর বেশিদিন থাকা উচিৎ নয় এই মনে করে জেন সেণ্টজনকে অনুরোধ করলো তার জন্য একটা কাজ জুটিয়ে দিতে। কাজ পেতে দেরি হলো

না। মর্টন গ্রামের ছোট্ট একটি মেয়েদের স্কুলে জেন শিক্ষিকার কাজ পেয়ে গেল। দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু মিঃ রচেষ্টারের কথা এক মুহূর্তও জেন ভুলতে পারেনি। অবসর মুহূর্তে তাঁর কথা ভেবে জেনের চোখে জল থামতে চায় না। সেণ্টজন একদিন তাকে কাঁদতে দেখে দুঃখিত হলেন এবং অতীতের কথা না ভেবে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে বললেন।

রোজামণ্ড অলিভার নামে একটি সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে সেণ্টজনকে ভালোবাসে। সেণ্টজনও তাকে পছন্দ করেন কিন্তু তাকে বিয়ে করবেন এমন কোনো ইঙ্গিত তাঁর ব্যবহারে পাওয়া যায় না। জেন একদিন সেণ্টজনকে জিজ্ঞাসা করলো রোজামণ্ডকে তিনি বিয়ে করছেন না কেন? তিনি কি তাকে ভালোবাসেন না? সেণ্টজন ভালোবাসার কথা অস্বীকার করলেন না। কিন্তু তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মিশনারী হওয়া, সে জীবনের জন্য রোজামণ্ড একেবারে অযোগ্য।

ইতিমধ্যে মিঃ ব্রিগসের একটি চিঠিতে জেনের আত্মপরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লো। জেনের কাকা মৃত্যুকালে বিশ হাজার পাউণ্ড জেনকে দিয়ে গেছেন। সেজন্য মিঃ ব্রিগস্ জেন আয়ারের খোঁজ করছেন। জেন জানতে চাইলো মিঃ ব্রিগস সেণ্টজনের কাছে জেনের খোঁজ কেন করছেন? তখন জানা গেল জেনের কাকা সেণ্টজনের মার সহোদর ভাই। জেনের খুব আনন্দ হলো। পৃথিবীতে এতদিন সে একা ছিল, এখন রক্ত সম্পর্কিত তিনটি ভাই বোন জুটলো। সেণ্টজনের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও কুড়ি হাজার পাউণ্ড চারজনেই সমান ভাবে পাওয়ার ব্যবস্থা জেন করলো।

বড়দিনের ছুটিতে বোনেরা এলে একদিন সেণ্টজন তাদের বললেন আগামী বছরেই তিনি মিশনারী হয়ে ভারতবর্ষে যাবেন। ক্রমশ জেন বুঝতে পারলো সেণ্টজন তার সঙ্গ পছন্দ করেন। জেন জার্মান শিখছিল। তার বদলে তাকে সেণ্টজন হিন্দুস্থানী শিখতে বললেন। তিনি নিজে হিন্দুস্থানী শিখছেন, জেন তাঁকে সাহায্য করতে পারবে।

এদিকে জেন রচেষ্টারের খবরের জন্য মিসেস ফেয়ারফ্যাক্সকে দুখানা চিঠি লিখেও কোনো উত্তর পায়নি। মনে তার ভীষণ দুশ্চিন্তা আর কষ্ট। একদিন হিন্দুস্থানী শিখতে বসে সেণ্টজনের সামনেই সে কাঁদতে সুরু করে দিল। সেণ্টজন কিছু বললেন না। তাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে গেলেন। বহুক্ষণ চুপচাপ বেড়ানোর পর তিনি জেনকে তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে যেতে বললেন। জেনকেই তিান তাঁর যোগ্য স্ত্রী বলে মনে করেন কারণ জেনের প্রকৃতি মিশনারীর স্ত্রী হবারই উপযুক্ত। কিন্তু জেন কি করে রাজি হয়? তার মন যে রয়েছে বাঁধা বচেষ্টাবেব কাছে। তাছাড়া সেণ্টজন রিভার্স তাকে তো ভালোবেসে বিয়ে করতে চাইছেন না। চাইছেন মিশনারী কাজে তাঁকে সাহায্য কববার জন্য। প্রেম ছাড়া বিয়ে জেনের কল্পনায় নেই। তবু দিনের পর দিন সেণ্টজনের ধৈর্য ও নিষ্ঠা ও মিনতিতে তার মন নরম হলো। বিয়ের প্রস্তাবে সে সম্মতি দেবে ভাবতে লাগলো। কিন্তু তবুও মনে দ্বিধা কিছুতেই কাটে না।

রাত্রে দুজনে বসে আছেন, হঠাৎ জেনের মনে হলো তার হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, অনুভূতি হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ সজাগ। আর সেই অনুভূতির খোঁচা যেন ছড়িয়ে পড়লো মাথা থেকে পা পর্যন্ত। চোখ মেলে জেন কি যেন দেখতে চাইছে, কান পেতে কি যেন শুনছে।

সেণ্টজন জিজ্ঞাসা করলেন, "াক দেখছো জেন? কি শুনছো?"

জেন তো কিছু দেখেনি। সে শুধু শুনেছে একটি করুণ কাতর ডাক—"জেন! জেন! জেন!"

জেন চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"এই যে, আসছি আমি; দাঁড়াও, এক্ষুণি আসছি।" এক ছুটে সে বাগানে নেমে এল—

"কই, কোথায় তুমি?"

দূরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে শব্দ ফিরে এল "কোথায় তুমি?" ফারগাছের পাতায় মর্মর ধ্বনি শোনা গেল। চারিদিক নিঃস্তব্ধ, কেউ কোথাও নেই।

পরদিন সেণ্টজন রিভার্সের অনুপস্থিতিতে ডায়না ও মেরীর কাছে বিদায় নিয়ে জেন রওনা হলো থর্নফিল্ডে। বাড়ির কাছে পৌঁছেই মনে লাগলো প্রচণ্ড ধাক্কা। সেই সুন্দর বাড়িটি কই? আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে শুধু ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। বাড়ির লোকজনেরাই বা সব কোথায় গেল?

নানা জায়গায়, নানা লোকের কাছে খোঁজ করতে করতে হদিশ মিললো। গ্রেসপুলের অসতর্কতার সুযোগে মিঃ রচেষ্টারের উন্মাদ স্ত্রী বাইরে বেরিয়ে এসে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। অন্য সবাইকে বাড়ির বাইরে এনে মিঃ রচেষ্টার স্ত্রীকে আনবার জন্য আবার ভিতরে যান। স্ত্রী তখন ছাদের উপরে। সেখান থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে সে নিচে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। রচেষ্টার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় জ্বলন্ত সিঁড়ি তাঁকে নিয়ে ভেঙে পড়ে। ধরাধরি করে সবাই তাঁকে বাইরে আনে। একটা চোখ চোট লেগে নষ্ট হয়ে যায়। একটা হাত এমন ভাবে ভাঙে যে বাদ দিতে হয়। কিছুদিন পর বাকি চোখটাও ফুলে ওঠে এবং সেটিও নষ্ট হয়ে যায়। আপাতত তিনি আছেন ফার্ণডিনের (Ferndean) একটা ছোট ম্যানর হাউসে। দুজন ভৃত্য তাঁর দেখাশুনা করে।

শোনামাত্র একটুও দেরি না করে জেন রওনা দিল ফার্ণডিনের পথে। সন্ধ্যার মুখে সেখানে সে পৌঁছলো। বাড়ির সামনে বাগানে দাঁড়িয়ে সে ভাবছে এত নির্জন জায়গা, কেউ কি এখানে থাকে? হঠাৎ দেখে পাশের ছোট্ট দরজা খুলে হাৎড়াতে হাৎড়াতে সেদিকে আসছেন মিঃ রচেষ্টার। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে জেন আড়ালে থেকে লক্ষ করতে লাগলো। মিঃ রচেষ্টার তেমনি ভাবেই আবার বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। জেন এবার বাড়িতে ঢুকলো। বিস্মিত পরিচারিকার হাত থেকে চায়ের ট্রে নিয়ে রচেষ্টারের কাছে এল। জেনের গলার আওয়াজে রচেষ্টার চমকে উঠলেন; তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন?

"তুমি কি জেন? জেন আয়ার?"

রচেষ্টারের একখানি হাত দু হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে জেন উত্তর দিল—"হ্যাঁ, আমি জেন আয়ার। কত খুঁজে আমি তোমাকে বার করেছি। আমি ফিরে এলাম তোমার কাছে।"

দুঃখের মধ্যে তাদের মিলন হলো। এবার রচেষ্টারকে বিয়ে করে ভালোবাসা সেবা যত্নে জেন তাঁর শূন্য জীবনকে ভরে তুললো।

শার্লট ব্রন্টির উপন্যাসে

জেন আয়ার

জেন আয়ার চরিত্রটি শার্লট ব্রন্টির এক অপূর্ব সৃষ্টি। জেন আয়ারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম আধুনিক স্বাধীনচেতা নির্ভীক মেয়ের অনুপ্রবেশ ঘটলো ইংরেজি কথা সাহিত্যে।

'জেন আয়ার' নায়িকা-কেন্দ্রিক উপন্যাস এবং নায়িকার নামেই উপন্যাসটি নামাঙ্কিত। শুধু নায়িকা-কেন্দ্রিক বলাই যথেষ্ট নয়, নায়িকার অনুভূতি-কেন্দ্রিক। বাইরের জগতের সঙ্গে নায়িকার সম্পর্ক, তার বিচিত্র বিপরীত অভিজ্ঞতা ও ঘটনাবলীর বর্ণনার মধ্যে তাই উপন্যাসের আত্মা খুঁজে পাওয়া যাবে না। শার্লট ব্রন্টির নিজের চরিত্রে যেমন তেমনি জেন আয়ারের চরিত্রেও তিনি কেল্টিক ও টিউ-টনিক উভয় মানসিকতার মিলন ঘটিয়েছেন। শার্লট ব্রন্টির নায়িকা তাই দুর্মর আবেগময়ী হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিতে প্রোজ্জ্বল ও চরিত্রে দৃঢ়।

শৈশব থেকেই জেন ভাগ্যবিড়ম্বিত। তার মধ্যে নিপীড়িত আত্মার মহিমা ও সৌন্দর্য দেখাতে চেয়েছেন লেখিকা। তিনি নিজে ব্যক্তি-জীবনে যে বিদ্রোহ করার সাহস করেননি, সেই বিদ্রোহ করেছে তাঁর নায়িকা। ছোট্ট জেন, মামাতো ভাইবোনদের শত উৎপীড়নে ও ভয়ে যে মুখ খোলে না, দেখি হঠাৎ সে তাদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত। শাস্তিস্বরূপ তাকে থাকতে হলো একতলা ঘরে আবদ্ধ। এই অভিজ্ঞতার পরও সে কিন্তু সব কিছু মেনে নিল না বরং মিসেস রীডকে যা খুশি তাই শুনিয়ে দিল। না পেরে মিসেস রীডই রণে ভঙ্গ দিলেন। এটাই হলো জেনের প্রথম কঠিনতম যুদ্ধে প্রথম বিজয়। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তার মধ্যে বিবেক বোধ

প্রবল। তাই বিজয়ের গৌরব বা আনন্দের বদলে সে আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হলো এবং নিজেকে ভাসিয়ে দিল অনুশোচনার অশ্রুতে। স্কুলে হেলেন বার্নস্কে অন্যায় ভাবে শাস্তি ও অপমান নীরবে সহ্য করতে দেখে জেনের অস্বস্তি হতো। হেলেনের সব কিছু মেনে নেবার প্রবৃত্তি সে ঠিক বুঝে উঠতে পারতো না। অন্য সব প্রতিকূলতাকে জেন সহ্য করবে কিন্তু অন্যায়কে নয়। তাই প্রবল অন্যায়ের মধ্যে তার মনে সর্বদা চিন্তা কি করে নির্মম পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে সে।

শিক্ষা সমাপ্তে জেনকে দেখা বায় থর্নফিল্ড হলে গভর্নেস রূপে। তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এইখানেই। আত্মকাহিনীমূলক উপন্যাস বলে জেনের আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে এবং কাহিনীকে অনুসরণ করি। শার্লট ব্রন্টি অবশ্য জেনের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ যে সম্পূর্ণভাবে করতে পেরেছেন তা নয়। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারও তিনি করেননি। জেনের চরিত্রে ঈর্ষা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা প্রভৃতির বদলে দুঃখ সহ্য করবার নিষ্ক্রিয় মনোভাবই আগাগোড়া। নিজের দৈহিক সৌন্দর্যের দৈন্য সম্বন্ধে সে সচেতন কিন্তু সেজন্য তার আপশোষ নেই। কখনো কখনো নিজের সম্বন্ধে নিজেই ভেবেছে "আমি সুন্দরী নই……মাথায় খাটো, রং ফ্যাকাশে, গড়নও ভালো নয়……।" এই দৈহিক অপরিপূর্ণতার পরিপূরণ সে চেয়েছে পড়াশুনার মধ্যে, ছবি এঁকে, প্রকৃতিকে ভালোবেসে। মনে তার জ্বলন্ত আবেগ, সৎসাহস, ন্যায়নিষ্ঠা ও সংকল্পে দৃঢ়তা। আপন ভাগ্যকে জয় করবার সঙ্কল্প তার মনে। কিন্তু সে জন্য নিজেকে জাহির করতে চায়না সে। মনোমতো ঘটনা ঘটুক সে চায় কিন্তু ঘটনা ঘটানোয় সক্রিয় অংশ সে নিতে চায় না। বরং অপ্রীতিকর অস্বস্তির উদ্ভব হতে পারে এই ভয়ে ঘটনার সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে তুলবার জন্য প্রয়োজন বুঝলে সে ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরে পালায়। এটা তার পলায়নী মনোবৃত্তি নয়। মনোমতো ঘটনা ঘটতে না দিয়ে নিজেও সে দারুণ কষ্ট পায়।

মনে তার দুরন্ত আবেগ ; সেই আবেগ নিয়ে সে রচেষ্টারকে ভালো-বেসেছে। তবু ভাগ্যাহত, বিড়ম্বিত রচেষ্টারকে ফেলে সে চলে গিয়েছে অনির্দিষ্টের পথে। এখানে তার নীতিজ্ঞান প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রচেষ্টারকে ছেড়ে যাওয়া তার কাছে মৃত্যুরও বাড়া, কিন্তু বিবাহের পবিত্র বন্ধন ছাড়া অন্য ভাবে তাঁর কাছে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। "থাকলে ক্ষতিই বা কি ? কারো তাতে কিছুতো যাবে আসবে না—" মনের এই ক্ষণিক দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলবাব মতো শক্তি আছে তার—"আমি নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পাবো। যত নিসঙ্গ, অসহায়, বন্ধুবিহীন হবো, ততই নিজেকে বেশি সম্মান দিতে শিখবো।"

দুর্ভাগ্যের জন্য কাউকে দায়ী করা জেনের স্বভাব নয়। ভাগ্য-বাদীর মতো, স্টোয়িকদের মতো, বিশ্বাসী খৃষ্টানের মতো সে অভিযোগ না তুলে নিজেকে প্রস্তুত রাখে। এই প্রস্তুতির মূল্য সে দেয় নিজেব প্রতি কঠোর ও নির্মম হয়ে।

জেনের রুচি আগাগোড়া পিউরিটান। সাজগোজ, অলঙ্কাব, জাঁকজমক সে ভালোবাসেনা, পুরুষের চাটুকারিতাও তার অসহ্য। বলতে গেলে জীবনের হালকা দিকটাই তার অজানা। সত্যকে সে কখনো অস্বীকার করে না বা সত্য বলতে ভয় পায় না। রচেষ্টার সুন্দর কি না এ প্রশ্নেব জবাবে সে তাঁর মতো রাশভারী লোককেও সরল ভাবে বলে দেয় "না, মোটেই না।" আবার অন্যত্র যখন বলে "সুন্দর দেখাবার জন্য কোনো যাদুমন্ত্র দরকার হয় না, ভালোবাসার চোখেই সে যাদুমন্ত্র : সে চোখের কাছে আপনি অপূর্ব সুন্দর," তখন এই প্রচ্ছন্ন স্বীকারোক্তির মধ্যে তার সরল সংযত ভালো-বাসারই প্রকাশ পায়। রূপ বা পদমর্যাদা না থাকলেও সে নিজেকে কারো অপেক্ষা হীন মনে করে না। পার্থিব উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তার নেই। তার জীবনের অভিযান আত্মিক অভিযান। কাকার উইলের টাকা পেয়ে সে যখন ধনী তখনো তার মনে সুখ বা শান্তি নেই। সে আরো কিছু চায় যা টাকার চেয়ে অনেক বড়

এবং এ জন্য উইলের টাকা নিজে সব না ভোগ করে ভাগ করে নিতে উদ্যোগী হয়।

মনের গোপনে জেন যেন মিরাক্‌লে বিশ্বাসী। অবিশ্বাস্য মিরাক্‌ল তার জীবনে ঘটেও। রচেষ্টারের সঙ্গে নাটকীয় প্রথম সাক্ষাৎ একটি মিরাক্‌ল, নিরালা রাত্রির অন্ধকারে বহুদূর থেকে ভেসে আসা রচেষ্টারের করুণ আর্তনাদও একটি মিরাক্‌ল। জেনকে আমরা দেখি প্রয়োজনে সে যেমন কঠোর, আবার তেমনি কোমল। রচেষ্টারকে ছাড়তে দুঃখে তার বুক ভেঙে গেছে, কিন্তু নির্মম ভাবে আত্মশাসন করে চলে যেতে তার বাধেনি। আবার রচেষ্টারের দুঃখ দুর্দশার দিনে প্রেম ও বন্ধুত্বের ডালি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

উপন্যাসের পরিণতির মধ্যে জেনেরও পরিণতি। ভাগ্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে এবার তার বিশ্রাম। অন্ধ, পঙ্গু রচেষ্টাবকে বরণ করার মধ্যে ভালোবাসার সঙ্গে আদর্শবাদী মনেরও প্রাধান্য দেখা যায়। ভালোবাসার সংজ্ঞা তার কাছে জাগতিক বা সাংসারিক সুখের একটি প্রাক্‌-শর্ত নয়। তা হলে জেন তরুণ পাদ্রী সেণ্টজনকে অগ্রাহ্য করে দৃষ্টিহীন, বিকলাঙ্গ, সর্বজননিন্দিত রচেষ্টারের কাছেই ছুটে যেত না। ভালোবাসাকে ভোগ্য না করে সাধনার সামগ্রী বলে সে গ্রহণ করেছিল। সেই সাধনায় যখন সিদ্ধিলাভ হলো তখন ধন, মান, মর্যাদা এসব নয়, এক অপার্থিব আত্মিক মহিমায় সে মণ্ডিত হয়ে উঠলো। প্রেমের বিলম্বিত পরিণতির মধ্যে আত্ম-আবিষ্কার এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা একাকার হয়ে গেল।

রচেষ্টার

অতিক্রান্তযৌবন, নাতিদীর্ঘ, রুক্ষ চেহারা মিঃ এডওয়ার্ড ফেয়ার-ফ্যাক্স রচেষ্টার নিঃসন্দেহে কাহিনীর নায়ক। নারীচরিত্রের মতো পুরুষচরিত্র, বিশেষতঃ প্রধান পুরুষচরিত্র চিত্রণে শার্লট ব্রন্টি ততটা পারদর্শিনী নন। এক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতার অভাবই এই অক্ষমতার

কারণ। পুরুষদের সম্বন্ধে তাঁর যেটুকু ধারণা বা জ্ঞান ছিল সেটুকুই অতিরঞ্জিত করে এমনভাবে তিনি উপন্যাসের মধ্যে তাদের গড়েন যে, স্বাভাবিক মানুষ বলে তাদের কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

মিঃ রচেষ্টারের মধ্যে ঘটেছে পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ। তিনি সুপুরুষ নন কিন্তু পৌরুষ ও প্রভুত্বব্যঞ্জক তাঁর ব্যক্তিত্ব। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তিনি গর্বিত, খামখেয়ালী; দুনিয়া সম্পর্কে বিদ্রূপের হাসি তার মুখে, অধঃস্তনদের প্রতি ব্যবহারে তিনি কর্কশ। কিন্তু জেন আয়ারের প্রতি তাঁর ব্যবহার গোড়া থেকেই রহস্যময় ও নাটকীয়। তাঁর মতো মর্যাদাসম্পন্ন লোকের কাছ থেকে ঠিক এই ব্যবহারও আশা করা যায় না। কিন্তু তাঁর অতীত ইতিহাস যখন আমরা জানি তখন তাঁর এই অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। পনেরো বছর আগেও পৃথিবী ছিল তাঁর কাছে সুন্দর, মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। জেন আয়ারের মতোই তাঁর মন ছিল সরল ও পবিত্র। কিন্তু বারে বারে বঞ্চনা, প্রতারণার আঘাতে তিনি হয়ে উঠেছেন আজকের দিনের রচেষ্টার। মানুষকে তিনি এখন দেখেন সন্দেহের চোখে, অনুকম্পার চোখে। অর্থলোভী পিতার ষড়যন্ত্রে একুশ বছরের তরুণ রচেষ্টার বিবাহ করেছিলেন এক উন্মাদ নারীকে। সমস্ত স্বপ্ন, আশা তাঁর ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। জীবন জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন দেশে দেশে একটু শান্তিলাভের আশায়। অবৈধ প্রেমের মধ্যেও খুঁজতে চেয়েছিলেন আত্মার আশ্রয়। কিন্তু সেখানেও জুটেছিল আঘাত। তাঁর ফরাসী প্রেমিকা একটি কন্যা উপহার দিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। রচেষ্টার কর্তব্যজ্ঞানহীন নন। শিশুকন্যাকে তিনি নিয়ে এলেন বাড়িতে, তার শিক্ষার ব্যবস্থার দিকেও মন দিলেন। মিস ইনগ্রাম তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন শুধু তাঁর অর্থ ও প্রতিপত্তির লোভে, ভালবেসে নয়। কিন্তু রচেষ্টার মিস ইনগ্রামের সৌন্দর্যে ও চাতুর্যে ভোলেননি। তাঁর মন এখন সদাজাগ্রত, সচেতন। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

সন্দেহ, অবিশ্বাস ও তিক্ততার মধ্যে জেন নিয়ে এল মুক্তির আভাস। জেনের সরল সুন্দর চোখের দিকে তাকিয়েই রচেষ্টার বুঝলেন এই মেয়ের কাছেই আছে তাঁর জীবনের পরম কাম্য বস্তু। কিন্তু অবিশ্বাসী মন, জেনকেও বারে বারে যাচাই করতে চায়। ক্রমে ক্রমে বুঝলেন সর্বব্যাপারে জেনকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। এপর্যন্ত যাদের দেখেছেন তাদের সবার চাইতে জেন আলাদা।

প্রেমের পরীক্ষায় জেন উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। কিন্তু বহু পরীক্ষার মানদণ্ডে বারে বারে জেন বিজয়িনী। কিন্তু সমস্যার তো সমাধান হয়না। স্ত্রী উন্মাদ হলেও জীবিত আছে। যদিও সে স্ত্রীর অস্তিত্ব কেউ জানেনা তবু বিবেকের দিক থেকে জেনকে কি করে তিনি বিবাহ করবেন? অনেক দ্বিধা সংশয়ের পর স্থির করলেন তিনি যত কষ্ট পেয়েছেন জীবনে তাতেই তাঁর অপরাধের ক্ষালন হয়ে গেছে। জেনকে বিবাহ করলে ঈশ্বর তাঁকে মার্জনাই করবেন। সুখভোগ থেকে বঞ্চিত জীবনে সুখের আকাঙ্ক্ষা করার অধিকার তাঁর আছে।

কর্তব্যজ্ঞানী রচেষ্টারের মনেও যে দুর্বার আবেগ আছে তার প্রকাশ পাওয়া যায় জেনের সঙ্গে বিবাহ বানচাল হবার পর। যে আবেগ এতদিন অবরুদ্ধ ছিল পূর্ণ জোয়ারে তা যেন জেন আয়ারকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাঁর দ্বিতীয় সত্তা জেন; সেই জেনের চলে যাবার সম্ভাবনায় তিনি প্রায় পাগল হয়ে ওঠেন। বিবাহ-বন্ধন ছাড়াই তিনি জেনকে তাঁর কাছে থাকবার জন্য করুণ মিনতি করতে থাকেন। কিন্তু জেন আয়ার আদর্শভ্রষ্ট হতে পারে না। রচেষ্টারকে ছাড়তে তার হৃদয় বিদীর্ণ হলেও সে চলে গেল।

হতভাগ্য রচেষ্টারের অদৃষ্টে আরো দুঃখ ছিল। উন্মাদ স্ত্রী তাঁকে পুড়িয়ে মারতে চেয়ে বাড়িতে আগুন ধরালো। এখানেও দেখা যায় রচেষ্টারের কর্তব্যজ্ঞান। স্ত্রীকে নিরাপদে বাইরে আনতে গিয়ে তিনি হলেন অন্ধ, অঙ্গহীন।

শেষ পর্যায়ে রচেষ্টারকে দেখি নির্জন ম্যানর হাউসে। সব গর্ব,

সব মর্যাদা তাঁর ধূলায় লুটিয়ে গেছে। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে শেষের দিনের অপেক্ষা করছেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতি অকরুণ নন। দীর্ঘ বিলম্বিত প্রতীক্ষার পর তিনি পেলেন জেন আয়ারকে। সব দুঃখ, সব বঞ্চনা সার্থক হলো প্রেমের চরম সিদ্ধিতে।

রচেষ্টারের মধ্যে কিছু বায়রনসুলভ মনোবৃত্তি থাকলেও লেখিকার চিত্রণ-কৌশলে এ চরিত্রটি পাঠকের সহানুভূতি ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। ভালোমন্দ উভয় প্রকার কাজেরই ঝুঁকি নেবার মতো নৈতিক সাহস তাঁর আছে। নিজের মনে তিনি খাঁটি তাই জাগতিক অর্থে যা অপরাধ তাকে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই পরোয়া করেন না। তিনি গুণগ্রাহী, রসজ্ঞ লোক। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতেও উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করতে জানেন। তাই বহু বিরোধ সত্ত্বেও এবং সর্বদা বাস্তবানুগ না হলেও রচেষ্টার চরিত্রটি কল্পনা করতে এবং তাকে অনুসরণ করতে পাঠকের কষ্ট হয় না।

শার্লট ব্রন্টির

আরও দুটি উপন্যাস

দি প্রফেসর (গল্প সংক্ষেপ)

মাতাপিতৃহীন উইলিয়ম ক্রিমস্ওয়র্থ (W. Crimsworth) ধনী মামার বাড়িতে আশ্রিত। মামার সঙ্গে বচসা হওয়ায় সে সেখান থেকে চলে এসে তার ভাই এডওয়র্ডের (Edword) অধীনে কেরানির কাজ নেয়। ঘটনাচক্রে সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে ব্রাসেল্‌সে (Brussels) মিঃ পেলেটের (Pelet) স্কুলে প্রফেসরের পদ পায়। বাড়তি আয়ের জন্য কাছেই মাদাম্যজেল জোরেড রয়টারের (Mlle Zora de Reuter) স্কুলেও সে পড়ায়। জোরেড রয়টারকে তার ভালো লাগে, কিন্তু জানতে পারে যে পেলেটের সঙ্গে গোপনে বিয়ের জন্য সে চুক্তিবদ্ধ। এরপর উইলিয়ম আধা-সুইস্ আধা-ইংরেজ সেলাই শিক্ষিকার প্রেমে পড়ে। জোরেডের অনেক বাধা সত্ত্বেও তাদের মিলনে বাধা হয়না। বিয়ের পর ওরা দুজনে একত্রে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। অবশেষে একটি সন্তানসহ ওরা ইয়র্কশায়ারে গিয়ে বসবাস করে।

'ভিলেট' (গল্প সংক্ষেপ)

নায়িকা লুসী স্নো (Lucy Snow) বিত্তহীন, শ্রীহীন, সম্পূর্ণ অসহায় একটি মেয়ে। ব্রাসেল্‌সের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে সে জীবিকা অর্জন করে। দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে প্রথম থেকে যুদ্ধ করে চরিত্র তার ইস্পাত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। গুণে সে সকলেরই প্রিয়। বিশেষত প্রধান শিক্ষিকা মাদাম বেকের (Madam Beck) সে অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী।

স্কুলে মেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের জন্য জন ব্রেটন (John Breton) নামে একটি তরুণ চিকিৎসক এলে লুসী তাকে তার ধর্ম-মার ছেলে বলে চিনতে পারে। বহুদিন পর সুন্দর তরুণ জন

ব্রেটনকে দেখে লুসীর মনে দারুণ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কিন্তু লুসী বুদ্ধিমতী। সে জানে এ অসম্ভব। জন ব্রেটনের পাশে দাঁড়ানোর মতো রূপ, গুণ, অবস্থা কিছুই তার নেই। অনেক চেষ্টায় মনের আবেগকে সে সংযত করে রাখে।

জন ব্রেটন এদিকে গিনেভ্রা ফ্র্যানশ (Ginevra Franshawe) নামে একটি চটুল, অপদার্থ মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এজন্য লুসীর মনে খুব দুশ্চিন্তা। এ ধরনের মেয়ে জন ব্রেটনকে কোনোদিন সুখ ব শান্তি দিতে পারেনা। হয়তো জনের জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। সৌভাগ্যক্রমে গিনেভ্রার প্রতি জনের এই আকর্ষণ বেশিদিন স্থায়ী হলোনা। বাল্যসঙ্গিনী সুন্দরী পলিনা হোমের (Paulina Home) মধ্যে সে তার প্রকৃত ভালোবাসার পাত্রীকে খুঁজে পেল।

কাহিনীর প্রধান বিষয় হলো প্রফেসব পল এমান্যুয়েলের (Paul Emanuel) প্রতি লুসী স্নোর অনুরাগ। পল এমান্যুয়েল জন ব্রেটনের মতো সুপুরুষ নন কিন্তু বিরাট ব্যাক্তিত্ববিশিষ্ঠ। মেজাজ কড়া, সকলকেই তাঁর কথা শুনে চলতে হবে, এই তাঁর মনোভাব। কিন্তু অন্তরে তিনি মহৎ। পলের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব লুসীর মনকে 'আকৃষ্ট করলো। মাদাম বেকের সঙ্গে পলের অন্তরঙ্গতায় লুসী ঈর্ষা অনুভব করে। কিন্তু সে অন্তরঙ্গতা ক্ষণস্থায়ী। পল ক্রমশ এই রূপহীনা মেয়েটির অন্তর-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন। লুসীব সংস্পর্শে তাঁর চরিত্রেরও বদল ঘটলো। তিক্ততা ও কাঠোরতার বদলে তাঁর মধ্যে এল স্নিগ্ধতা, কোমলতা, অপরের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সাহায্যে লুসী ব্রাসেলসে একটি স্কুল গড়ে তুললো। মিলনের যখন সব বাধা অপসারিত তখনই এল বিচ্ছেদের পালা। বিশেষ কাজ নিয়ে পলকে দীর্ঘদিনের জন্য যেতে হলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। পল আর ব্রাসেলসে ফিরবেন কিনা এবং লুসীর সঙ্গে বিয়ে হবে কিনা তার কোনো ইঙ্গিত শার্লট দেননি। সে বিচার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়ে এইখানেই তিনি উপন্যাসটি শেষ করেছেন।

শার্লট ব্রন্টির

রচনা-শৈলী

শার্লট ব্রন্টির সীমিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস তাঁর কাছে ছিল অপরিহার্য। আত্মজীবনীর নির্দিষ্ট ধারাকে অনুসরণ করেই বাল্য ও কৈশোর থেকে তিনি আরম্ভ করেছেন কাহিনী। আবেগ ও কল্পনার রঙে তাঁর প্রতিটি অন্তর্মুখীন কাহিনী উজ্জ্বল। নিজস্ব অভিজ্ঞতাই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে গল্পের ঘটনার এত মিল যে, বলা যায় প্রতিটি উপন্যাসের নায়িকা শার্লট ব্রন্টি নিজেই। 'জেন আয়ারে' লো-উড স্কুলের দুরবস্থার সঙ্গে কোয়ান-ব্রিজ স্কুলের দুরবস্থা এবং হেলেন বার্নসের মৃত্যুর সঙ্গে শার্লটের বড় বোন মারিয়ার মৃত্যুকে হুবহু মেলানো যায়। প্রভুত্বব্যঞ্জক, শক্তিমান, সংসার-অভিজ্ঞ, কঠোরপ্রকৃতি মিঃ রচেষ্টার মঃ হেগারেরই আরেক রূপ। তবু সূক্ষ্ম বিচারে এ দুজনকে হয়তো একেবারে মেলানো যায় না। মঃ হেগারকে ঘিরে শার্লটের মনে যে স্বপ্ন গড়ে উঠেছিল মিঃ রচেষ্টার যেন সেই স্বপ্নসঞ্জাত ভাবরূপ। বাস্তবানুগ মিল সেখানেই শেষ হয়ে যায়নি। সবক্ষেত্রেই তার ঘটেছে রূপান্তর,—বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক। যে রোমান্টিক কল্পনার বর্ণাঢ্য উজ্জ্বলতায় সৃষ্টি হয়েছিল অ্যাংগ্রিয়ায় জামোরনা (Zamorna) আর নর্দাংগারল্যাণ্ড (Northangerland), সেই উদ্দাম কল্পনা এখানেও। কারণ 'দি প্রফেসর' উপন্যাসটিতে যে রোমান্টিসিজমকে তিনি ইচ্ছা করে দমন রেখেছিলেন, 'জেন আয়ারে' তার অর্গল মুক্ত করে দিয়েছেন।

শার্লটের মনের ভাণ্ডারে অনেক স্মৃতি; মিসেস র‍্যাডক্লিফের গথিক উপন্যাসের রোমহর্ষক উত্তেজনার স্মৃতি, অনেক রোমান্স গল্পের চমকপ্রদ স্মৃতি। সবই প্রায় অজ্ঞাতসারে তাঁর কাহিনীর মধ্যে

এসেছে। থর্নফিল্ডের পুরোনো আমলের প্রাসাদতুল্য বাড়ি, অন্তঃপুরের ভয়াবহ নির্জনতা, রোমাঞ্চকর দৃশ্য, রহস্যময় কণ্ঠস্বর, পৈশাচিক হাসি। অশুভ লক্ষণ ও বিপদের পূর্বাভাস সব কিছু গথিক রোমান্সের কথাই মনে পড়ায়। বিবাহের পূর্বরাত্রে উন্মাদ নারীর অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে নির্মমভাবে দু-পায়ে মাড়ানোর দৃশ্যে প্রকৃতই তাকে মধ্যযুগীয় রূপকথার দানবী বলে মনে হয়।

'জেন আয়ার' আগাগোড়া রোমান্টিক উপন্যাস। রূপকথার গল্পের সেই অবহেলিত দরিদ্র কুমারীর রাজপুত্রের গলায় মালা দেওয়ার মতো। কেউ কেউ বলেছেন এ যেন শার্লট ব্রন্টির অবচেতন মনের ইচ্ছাপূরণ। কিন্তু গল্পের মোড় ঘুরতেই দেখা যায় নিছক ইচ্ছাপূরণ নয়। জাগতিক অর্থে গল্পের শেষে সুখে স্বচ্ছন্দে রাজরাণী হয়ে ঘরকন্না করা জেন আয়ারের অদৃষ্টে জোটেনি। সে বরণ করেছে অন্ধ, বিকলাঙ্গ লোককে, যার প্রাপ্য হয়েছে সকলের ধিক্কার। এইখানেই শার্লট বাস্তবে ফিরে এসেছেন।

ডিকেন্সের মতোই শার্লট ব্রন্টির উপন্যাসের গঠন-নৈপুণ্য শিথিল। শিথিল হলেও তা গতানুগতিক পথে চলেনি। বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ থাকলেও মূল গল্পের রস তাতে ব্যাহত হয়নি; লেখিকা কখনই মূল কাহিনী ছেড়ে পাঠকের মনোযোগ অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হতে দেননি।

কাহিনীর অবাস্তবতা শার্লট ব্রন্টির উপন্যাসগুলির আরেকটি ত্রুটি। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আর পাঁচ জন ঔপন্যাসিকের মতো নয়। তাঁর সৃষ্ট জগতের বাস্তবতা তাঁরই মানসলোকের। অভিজ্ঞতার অভাবকে পূর্ণ করেছে আবেগের তীব্রতা, তাঁর গল্প বলবার আশ্চর্য ক্ষমতা। ভালোমন্দ দু দিকেই তিনি অতি রোমান্টিক। নায়িকামাত্রেরই নিঃসঙ্গ, নির্যাতিত, অবহেলিত জীবন; মনে তাদের গভীর আবেগ ও কঠোর নীতিজ্ঞান। প্রত্যেকেই তারা অন্তর্মুখীন। তাই তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই দেখা যায় প্রচুর দীর্ঘশ্বাস, সেন্টিমেন্টালিজম, মেলোড্রামার ছড়াছড়ি।

ভিক্টোরীয় পিউরিটান চিন্তাধারার প্রতিফলন শার্লট ব্রন্টির মধ্যে পুরোমাত্রায়। প্রেমের স্থূল দিকটা তাই তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। কাহিনীর প্রধান উপপাদ্য বিষয় প্রেম হলেও তার প্রকাশে তিনি সীমাবদ্ধ। কম্পিত বুকের ভীরু প্রতীক্ষার কথাই তিনি জানেন। তাকে বিশ্লেষণ অথবা চরিত্রের উপর তার প্রতিক্রিয়ার খবর তিনি জানেন না। নায়িকারা সময়ে সময়ে অতিমাত্রায় ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এই নীতিজ্ঞানের জন্যই শার্লটের উপন্যাসকে গথিক কাহিনীর পর্যায়ে ফেলা যায় না।

চরিত্রচিত্রণে তিনি দুর্বল। শুধুমাত্র নায়িকার চোখ দিয়ে সকলকে দেখা হয়েছে বলেই অপ্রধান চরিত্রগুলি জেন অস্টেনের অপ্রধান চরিত্রগুলির মতো উজ্জ্বল ও বাস্তব হয়ে আমাদের চোখে ধরা পড়েনা। প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলিও স্পষ্ট নয়।

জীবনকে শার্লট বরাবর সিরিয়াস ভাবে দেখেছেন। তাই হাস্যরসের উপাদান তার মধ্যে তিনি খুঁজে পাননি। জীবন কেটেছে উদ্বেগ ও অশান্তির মধ্যে। কারো সম্বন্ধে হালকা ভাবে কথা বলাও তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তবু পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য কিছু হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস তিনি করেছেন। সময়ে সময়ে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের গুরুগম্ভীর আবহাওয়াকে লঘু করতে চেয়েছেন। কৌতুক সৃষ্টি করতে হলে যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ দরকার তা তাঁর ছিল না। তাই চেষ্টাকৃত ব্যঙ্গোক্তি লক্ষস্থলের অনেক দূর দিয়ে গিয়েছে।

'দি প্রফেসর' উপন্যাসটি সর্বপ্রথমে লেখা হলেও ছাপা হয় শার্লটের মৃত্যুর পর (১৮৫৭)। ছেলেবেলা থেকেই নানারকম লেখার অভ্যাসে লেখার কায়দা তাঁর রপ্ত ছিল। তবু উপন্যাসটিতে বহু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে। একটি বড় গল্পে প্রধান ও অপ্রধান কোন্ চরিত্রের উপর বেশি জোর দেবেন এবং শিল্পের দিক থেকেও কোন্টা প্রয়োজনীয় আর কোন্টা অপ্রয়োজনীয় সে হিসাব তাঁর ছিলনা। এটি বড় গল্পও নয়, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসও নয়। যে যুগে বিরাট আয়তন উপন্যাসের কদর সেই

যুগে এ ধরনের লেখা জনপ্রিয় হওয়া মুস্কিল ছিল। তাই প্রকাশকরা ছ'বার বইটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

'দি প্রফেসর' উপন্যাসটিতে শার্লটের যা বক্তব্য ছিল 'ভিলেট' (১৮৫৩) উপন্যাসটি তারই রকমফের। অন্যান্য উপন্যাসের মতো প্রধান চরিত্রের নাম অনুসারে এটির নাম নয়। 'ভিলেট' একটি জায়গার নাম। কাহিনীর অধিকাংশ ঘটনাই এখানে ঘটেছে। গঠন-নৈপুণ্যের দোষে কাহিনী এবং লুসীর চরিত্র-চিত্রণ ব্যর্থ হয়েছে। শার্লটের তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে ভিলেটই নিকৃষ্ট রচনা।

শার্লট ব্রন্টিকে কবি, দার্শনিক অথবা সমাজ সংস্কারক হিসাবে বিচার করলে চলবেনা। তিনি ঔপন্যাসিক এবং সেই বিচারে তিনি প্রশংসার যোগ্য। শার্লটের উপন্যাস প্রথম ছাপা হবার পর ডিকেন্স, থ্যাকারে, ট্রলোপ, জর্জ এ.লয়ট, মে রোডথ, হার্ডি কনরাড, ওয়েলস্, বেনেট প্রমুখ বহু সাহিত্যরথীর লেখায় ইংরেজি সাহিত্য সমৃদ্ধ। কিন্তু শার্লট ব্রন্টির নিজস্ব গৌরব এতে কমেনি।

শার্লট ব্রন্টি চিরাচরিত প্রথাকে অনুসরণ করে উপন্যাস লেখেননি। কারো বিশেষ প্রভাবেও তিনি প্রভাবান্বিত নন। নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে লিখেছেন তিনি। তাঁর সহজ সরল আবেদন পাঠকের মনে সহজেই পৌছায়। গল্প বলার কৌশল তাঁর অপূর্ব। এমন ভাবে বলেন যে পাঠক মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাহিনী অনুসরণ করে চলে। ঘটনার পর ঘটনা সাজানোয় তাঁর জুড়ি নেই। সংলাপ অনেক সময় দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর; ভাবগম্ভীর আবেগময় মুহূর্ত অনেক সময় অতিশয়োক্তির জন্য কিছুটা গুরুত্ব হারায় কিন্তু এমন আন্তরিক ভাবে তিনি বলেন যে সেগুলিও স্বাভাবিক মনে করতে পাঠকের বাধেনা।

এমিলি ব্রন্টির উপন্যাস

উয়েদারিং হাইটস

(গল্প-সংক্ষেপ)

'উয়েদারিং হাইটস' ইয়র্কশায়ারের ওয়েস্ট রাইডিংএ (West Riding) অবস্থিত একটি বড় খামার বাড়ি। রুক্ষ প্রান্তর ভূমির উঁচু একটা জায়গায় প্রাকৃতিক বিক্ষোভকে অগ্রাহ্য করে এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয় অর্থে উয়েদারিং হাইটস মানে ঝোড়ো টিলা। অর্থাৎ ঝড়, জল, দুর্যোগের লীলাভূমি। উয়েদারিং হাইটসের মালিক আগে ছিলেন মিঃ আর্নশ। স্ত্রী, ছেলে হিণ্ডলে, ও দুরন্ত ঝড়ের মতো শাসন-বাঁধন-হারা দুর্দান্ত একটি মেয়ে ক্যাথারিনকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। কিন্তু এই সুখের সংসারে একদিন অশান্তি দেখা দিল। মিঃ আর্নশকে কাজ উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় যেতে হতো। একবার লিভার পুলে গিয়ে তিনি পথ থেকে কুড়িয়ে আনলেন অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত একটি কালো ছেলেকে। হয়তো কোনো বিদেশী সৈনিকের ছেলে। পথের ধারে অসহায় অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখে মিঃ আর্নশ তাকে না এনে পারেননি। স্ত্রীর হাতে সঁপে দিয়ে তিনি বলেছিলেন—"যদিও দেখলে মনে হয় শয়তান একে পাঠিয়েছে, তবুও ঈশ্বরের দান বলেই একে গ্রহণ করো।" উড়ে এসে জুড়ে বসা এই জিপসী ছেলেটিকে হিণ্ডলে প্রথম থেকেই অপছন্দ করলো। ছেলেটির নাম দেওয়া হয়েছিল হীথক্লিফ। হীথক্লিফকে যে মিঃ আর্নশ ছেলের মতো ভালোবাসেন হিণ্ডলে সেটা সহ্য করতে পারছিল না। হীথক্লিফের উপর সে তাই অকারণে অত্যাচার ও পীড়ন চালাতে লাগলো। ক্যাথারিন কিন্তু প্রথমে হীথক্লিফকে অবজ্ঞা করলেও পরে ক্রমে তার ভক্ত হয়ে উঠলো। হিণ্ডলের তাতেও রাগ হতো। ক্যাথারিনকেও সেজন্য কম শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না। প্রথম থেকেই ক্যাথারিন বেয়াড়া ধরনের, দুরন্ত মেয়ে ছিল। হীথক্লিফের মধ্যে সে

তার নিজের স্বভাবেরই প্রতিফলন দেখতে পেত। তাই হিণ্ডলের বিরুদ্ধে তারা দুজনে একজোট হলো। ক্রমশ তাদের বন্ধুত্ব এত বেশি গভীর হলো যে কেউ কাউকে ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারতো না।

হীথক্লিফের প্রতি হিণ্ডলের অন্যায় দুর্ব্যবহারে মিঃ আর্নশ খুব দুঃখ পেতেন, রাগ করতেন ছেলের উপর। তাতে হিণ্ডলের উৎপীড়ন আরো বেড়ে যেত। হীথক্লিফ কিন্তু শত অত্যাচারেও মুখ বুজে থাকতো। শেষ পর্যন্ত হিণ্ডলেকে বাড়ি থেকে সরিয়ে পড়াশুনার জন্য অন্যত্র পাঠিয়ে দিলেন মিঃ আর্নশ। তাঁর শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। ছেলে এবং মেয়ে দুজনের জন্যই মনে তাঁর দারুণ দুশ্চিন্তা। ক্যাথারিন আরো চঞ্চল, আরো উদ্দাম হয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। হৈ-হুল্লা, নাচ-গান, চিৎকার দিনরাত তার লেগেই আছে। বাবার অসুখকেও সে গুরুত্ব দেয় না। তিনি তাকে ভদ্র, সংযত হতে বললেও তা কানে তোলে না। এইরকম মানসিক যন্ত্রণা নিয়েই তিনি একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তিনি মারা যাবার পর হিণ্ডলেকে বাড়ি চলে আসতে হলো। হিণ্ডলে একা এল না, সঙ্গে এল তার নববধূ। কবে যে সে বিয়ে করেছে কেউ তা আগে জানতো না। হিণ্ডলে বাড়ি এসেই সবকিছুর মালিক হয়ে বসলো। মেজাজ হয়ে উঠলো আরো চড়া, আরো নিষ্ঠুর। হীথক্লিফকে সে অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়লো। ক্যাথারিন আর হীথক্লিফ একত্রে লেখাপড়া শিখতো। হিণ্ডলের হুকুমে হীথক্লিফের লেখাপড়া বন্ধ হলো। এতদিন যে ছিল বাড়ির ছেলের মতো, হিণ্ডলে তাকে পাঠালো ভৃত্য মহলে, ক্ষেত মজুরের শ্রমসাধ্য কাজে তাকে নিযুক্ত করলো। ক্যাথারিন সুযোগ পেলেই লুকিয়ে হীথক্লিফের কাছে চলে যেত। কাজের শেষে হীথক্লিফ ক্যাথারিনের সঙ্গে বনে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতো। এইভাবে সারা সময় বনেজঙ্গলে বেড়িয়ে ক্যাথারিন যেন আরো বুনো আরো জংলী হয়ে উঠলো। ক্যাথারিন পড়াশুনা যা শিখতো মুখেমুখে তা শিখিয়ে দিত হীথক্লিফকে। সব

অত্যাচার, অবিচার আর উৎপীড়ন হীথক্লিফ ক্যাথারিনের মুখ চেয়ে সহ্য করে নিত। হিণ্ডলে এদিকে ততটা মন দিত না বলে ইচ্ছেমতো ক্যাথারিন চলতো। কখনো কখনো চোখে পড়লে অবশ্য হিণ্ডলে ছেড়ে কথা বলতো না। হীথক্লিফকে বেদম চাবুক লাগাতো, ক্যাথারিনকে খেতে না দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখতো। এতে ফল আরো উল্টো হতো। পালিয়ে তারা সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়াতো আরো বেপরোয়াভাবে। শাস্তি, বকুনি কোনো কিছুই তারা গায়ে মাখতো না।

উয়েদারিং হাইটস থেকে চার মাইল দূরে থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জ (Thrush-Cross Grange)। সেখানে মিঃ এবং মিসেস লিণ্টন নামে একটি সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবার, দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতেন। বেড়াতে বেড়াতে কখনো ক্যাথারিন ও হীথক্লিফ থ্রাশক্রসের সীমানায় চলে যেত। কিন্তু বাড়ির মধ্যে যাবার সাহস তাদের কোনোদিন হয়নি। একদিন বেড়াতে গিয়ে রাত্রি পর্যন্ত তারা ফিরলো না। বাড়ির বাইরে ভিতরে সর্বত্র খোঁজা হলো কিন্তু কোথাও তাদের পাওয়া গেল না। হিণ্ডলে খুব রেগে বাইরের দরজা বন্ধ করে সবাইকে শুতে বললো। হুকুম দিল ওরা এলেও ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওদের গৃহপালিকা (House-keeper) নেলী কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। সে গোপনে দরজা খুলে দেবে বলে জেগে বসে রইলো। শেষ পর্যন্ত হীথক্লিফ এল, কিন্তু একা। ক্যাথারিন কোথায় জিজ্ঞাসা করায় সে বললো "থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জে; আমিও থেকে যেতাম কিন্তু আমাকে বলার মতো ভদ্রতাটুকুও ওরা করলো না।"

ব্যাপার কি নেলী জানতে চাওয়ায় হীথক্লিফ বললো বেড়াতে বেড়াতে ওরা থ্রাশক্রস পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে ঘরের মধ্যে কে কি করছে দেখতে ওদের কৌতূহল হয়। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে ঘরে দুই ভাইবোনকে ঝগড়া কান্নাকাটি করতে দেখে। ওদের বাবা মা কেউ সেখানে ছিলেন না। বাবা মা না থাকায় ওরা কোথায় স্ফূর্তি করবে, তা নয় এডগার নীরবে কাঁদছে

আর বোন ইসাবেলা পরিত্রাহি চীৎকার করছে। দেখে হীথক্লিফ আর ক্যাথারিনের খুব হাসি পেল। হাসিটা একটু জোরেই হয়ে গেল। ঘরের ভিতর ভাইবোন চমকে উঠলো। তাদের কান্না থেমে গেল। মা বাবাকে প্রাণপণে তারা ডাকতে লাগলো। ইতিমধ্যে চোর ঢুকেছে ভেবে ওরা বাগানে কুকুর ছেড়ে দিয়েছে। কুকুর এসে ক্যাথ্যারিনের পা কামড়ে ধরলো। তারপর অবশ্য ওরা এসে ছাড়িয়ে দিল এবং ক্যাথারিনকে চিনতে পেরে খুব খাতির করে সেবা যত্ন করতে লাগলো। ক্যাথারিনের পা সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত তাকে ওরা ওখানেই রেখে দেবে। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছিল কিন্তু তবু হীথক্লিফকে থাকতে ওরা বললো না। তাই সে একা ফিরে এল।

হিণ্ডলে পরদিন সব শুনে ক্ষেপে গেল। হীথাক্লিফকে সে চাবুক মারলো না, কিন্তু ক্যাথারিনের সঙ্গে ভবিষ্যতে একটা কথাও যদি সে বলে তাহলে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হবে বলে ভয় দেখালো।

দুই

যে-ক্যাথারিন হীথক্লিফের সঙ্গে থ্রাশক্রসে গিয়েছিল সে আর ফিরলো না। ফিরলো আরেক ক্যাথারিন। পাঁচ সপ্তাহ থ্রাশক্রসে থেকেই সে যেন আগাগোড়া বদলে গিয়েছে। কায়দাদুরস্ত চকচকে পোষাক, কথাবার্তা, হাবভাবে পুরোদস্তুর একটি ভদ্রমহিলা। হিণ্ডলে তাকে দেখে খুশি হলো। "বাঃ ক্যাথি, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তো তোমাকে। প্রথমে তো চিনতেই পারিনি। রীতিমতো ভদ্রমহিলা হয়ে গিয়েছ। কোথায় লাগে ইসাবেলা তোমার কাছে!" ক্যাথারিন হীথক্লিফের খোঁজ করতে লাগলো। বেশভূষা, পরিচ্ছন্নতার দিকে কোনোদিনই হীথক্লিফের নজর ছিল না। ক্যাথারিন থ্রাশক্রসে থাকবার সময়ে তো তার দিকে তাকানোই যেত না এত অপরিচ্ছন্ন ভাবে থাকতো। যে মেয়েটিকে সে চিনতো, যে ছিল ধরনধারণে তার নিজেরই মতো, তার বদলে সাজগোজে ধরনধারণে সম্পূর্ণ অন্য একটি মেয়েকে দেখে তার সামনে আসবার উৎসাহ কমে গেল। তবু সকলের

অনুরোধে সে ক্যাথারিনের কাছে এল। ক্যাথারিন তাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে আদর করতে আরম্ভ করলো। তারপরই হঠাৎ হাসিতে ভেঙে পড়ে বলতে লাগলো—"অমন রাগ রাগ ভাবে মুখ কালো করে আছ কেন? কেমন মজার দেখাচ্ছে তোমাকে, বাবাঃ কি গম্ভীর। বোধহয় এডগার আর ইসাবেলাকে এতদিন দেখেছি বলেই এমন মনে হচ্ছে। আচ্ছা হীথক্লিফ, তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছ?" হিণ্ডলে হীথক্লিফকে ক্যাথারিনের করমর্দন করতে বললো। "না, আমাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ চলবে না। আমি তা সহ্য করবো না।" ক্যাথারিন হীথক্লিফের ময়লা হাতের দিকে একবার তাকালো এবং পোষাকের দিকে তাকালো পাছে ময়লা লেগে তার পোষাক নষ্ট হয়ে যায়।

হিণ্ডলে হীথক্লিফকে করমর্দন করতে আবার বললো। হীথক্লিফ জবাব দিল, "আমাকে ছোঁবার দরকার নেই তোমার। আমি নোংরা থাকি সে আমার ইচ্ছে। নোংরা থাকতে আমি ভালোবাসি, নোংরাই আমি থাকবো।"

এরপর থেকে ক্যাথারিনকে এড়িয়ে চলতে লাগলো হীথক্লিফ। ক্যাথারিন দুঃখ পেত বৈকি। কিন্তু তার জীবনে তখন আরেক বন্ধুর আবির্ভাব ঘটেছে। এডগার লিণ্টন। তাই হীথক্লিফের অনুপস্থিতির ফাঁক তার ভরা রইলো এডগারের সাহচর্যের স্মৃতিতে। এডগার সুযোগ পেলেই উয়েদারিং হাইটসে আসতো। বিশেষত হিণ্ডলে বাইরে কোথাও গেলে ক্যাথারিন তাকে গোপনে খবর পাঠাতো। হীথক্লিফের প্রতি এডগার কখনোই সন্তুষ্ট ছিলনা। হীথক্লিফও ভীরু, দুর্বলমনা, ধনীর দুলাল এডগারকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো। প্রথম যেদিন এডগার ও ইসাবেলা নিমন্ত্রিত হয়ে উয়েদারিং হাইটসে এসেছিল হীথক্লিফ ওদের সামনে আসায় হিণ্ডলে তাকে যা খুশি বলে অপমান করেছিল। এডগারও কিছু না বুঝে কিছু মন্তব্য করায় হীথক্লিফ তাকেও গরম ঝোলের পাত্র ছুঁড়ে মারে। এডগার তো কেঁদে কেটে অস্থির। হিণ্ডলে হীথক্লিফকে চাবুক মেরে না খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলো। অনেক পরে ক্যাথারিন তাকে লুকিয়ে বার

করে রান্নাঘরে নেলীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। নেলীর দেওয়া খাবার নামমাত্র মুখে তুলে সে দুহাতের তেলোয় মুখ রেখে গভীরভাবে কি যেন ভাবতে লাগলো। "অত কি ভাবছ?"—নেলীর এই প্রশ্নে সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—"হিণ্ডলের অপমানের শোধ কি করে তুলবো তাই ভাবছি। যত দেরিই হোক না কেন সে দেরি আমার সইবে যদি শোধ নিতে পারি।······এই একটি চিন্তায় সব দুঃখ যন্ত্রণা আমি ভুলে থাকি।"

হিণ্ডলের স্ত্রী ছিল চিররুগ্ন। একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে সে মারা গেল। শিশুটি প্রতিপালনের সব ভার পড়লো নেলীর উপর। নেলী আনন্দের সঙ্গে সে ভার গ্রহণ করলো। শিশুটির নাম রাখা হলো হেয়ারটন। নেলী তাকে দেখা শুনা করছে দেখে হিণ্ডলের আর কোনো দায়িত্ব রইলোনা। সে নিশ্চিন্তে নিজের পথে চললো। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই তার মদ আর জুয়াখেলার দিকে প্রবল আসক্তি দেখা গেল। মেজাজও হয়ে উঠলো আরো কর্কশ ও রুক্ষ। সে মেজাজের তাল সামলাতে দাসদাসীরা অস্থির হয়ে উঠলো। তার এই অধঃপতন ক্যাথারিন ও হীথক্লিফের কাছে যেন দৃষ্টান্ত স্বরূপ হলো। হীথক্লিফকে এই সময়ে দেখলে মনে হতো কোনো শয়তান তার উপর ভর করেছে। হিণ্ডলে দিন দিন অধঃপাতের নিচের তলায় নামছে দেখে সে উৎকট উল্লাস অনুভব করতো। তার মধ্যে বন্য হিংস্রতার পূর্ণ প্রকাশ দেখা যেতে লাগলো। ক্যাথারিনও কম গেল না। পনেরো বছরের কিশোরী ক্যাথারিন তখন সৌন্দর্যে অতুলনীয়া। আর ঠিক সেই অনুপাতেই তার গরম মেজাজ, যা খুশি তাই করবার ইচ্ছে ও খামখেয়ালিপনা। লিণ্টনদের কাছে কিন্তু স্বভাবের এই দিকটা ক্যাথারিন চাপা দিয়ে রাখতো। এডগার এলে তাকে মধুর প্রকৃতি, ভদ্র, সংযত মেয়ে ছাড়া আর কিছু মনে হতো না। ক্যাথারিন নিজেকে যতই ভদ্রসমাজের উপযুক্ত করে পালিশ করে তুলছে, হীথক্লিফ ততই নিজের দিকে একেবারে নজর না দিয়ে আরো সকলের অবজ্ঞা ও ঘৃণাভাজন হয়ে পড়ছে। পড়াশুনায় ক্যাথারিনের সমান থাকবার

চেষ্টাই তার আগে ছিল, কিন্তু ক্রমশ সে সব বিসর্জন দিল। ক্যাথারিন যত উপরে উঠতে চাইছে, হীথক্লিফ তত নিচে নামছে। লোকের অবজ্ঞা ও বিদ্রূপেই যেন এখন তার আনন্দ।

ক্যাথারিন হীথক্লিফের সঙ্গে বেড়ানো বন্ধ করেনি কোনোদিনও। হীথক্লিফের ক্ষেত-খামারের কাজ শেষ হলে ওরা ঠিক আগের মতোই বেরিয়ে পড়তো। তফাৎ শুধু এই ছিল যে পারতপক্ষে হীথক্লিফ কথা বলতো না। ক্যাথারিন আগের মতো আদর করে কিছু বলতে গেলেও বিরক্ত হতো। যেন জানাতে চায় যে ওসবের আর কোনো দাম নেই তার কাছে।

একদিন হিণ্ডলে বাইরে গেলে হীথক্লিফ কাজে ফাঁকি দিয়ে বেড়াবে মনে করে ক্যাথারিনকে ডাকতে এল। ক্যাথারিন তখন এডগার আসবে বলে সাজগোজ করে তৈরি হচ্ছে। হীথক্লিফকে সে এড়াতে চাইলে হীথক্লিফ বললো, "তোমার ঐ নির্বোধ বন্ধুর জন্য আমাকে এমন করে ফিরিয়ে দিওনা।...কতদিন তুমি আমাকে বাদ দিয়ে ওর সঙ্গে কাটিয়েছ, ঐ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে দেখ। আমি প্রত্যেকটি তারিখ দাগ দিয়ে রেখেছি।" ক্যাথারিন চটে উঠলো, "তোমার সঙ্গেই সব সময় থাকতে হবে এমন কি কোনো কথা আছে? কি লাভ হয় আমার তোমার সঙ্গে থাকলে? না পারো কথা বলতে, না পারো আনন্দ দিতে। যার কিছু বলবার নেই, যে কিছু জানেনা তার সঙ্গ আবার সঙ্গ!" হীথক্লিফের কিছু বলার আগেই এডগার এসে হাজির হলো। হীথক্লিফ নীরবে সরে গেল।

ইতিমধ্যে এডগার বিয়ের প্রস্তাব করেছে এবং ক্যাথারিনও রাজি হয়েছে। নেলীকে এসে খবরটা জানালো ক্যাথারিন। রাজি হলেও তার মনে শান্তি নেই। হীথক্লিফের মলিন মুখ তার মনে অহরহ খোঁচা দিচ্ছে। তাই বিবেককে সন্তুষ্ট করতে বারবার সে নেলীর অনুমোদন চায়। নেলী বলে, "রাজি যখন হয়েছ তখন ভুল হলো কি ঠিক হলো সে প্রশ্ন অবান্তর।" ক্যাথারিন বলে, লিন্টনকে সে ভালোবাসে। জীবনে তার অনেক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। বাড়ি, গাড়ি, মান সম্মান, প্রতিপত্তি

লাভের বাসনা তার মনে। এডগার লিণ্টনকে বিয়ে করলে তার সব আশাই পূর্ণ হবে। নেলী তখন জিজ্ঞাসা করলো, "তবে আর তোমার মনে দ্বিধা কেন? যোগ্য পাত্রেই যখন মন দিয়েছ তখন এত ভাবছ কেন তা নিয়ে? বাধাটা তোমার আসছে কোথায়?" "বাধা আমার মনে, আমার অন্তরে। জানো নেলী, উয়েদারিং হাইটস ছেড়ে স্বর্গেও আমি যেতে চাইনে। আমি কি স্বপ্ন দেখি জানো? একবার দেখলাম স্বর্গে গিয়েছি, কিন্তু পৃথিবীতে ফিরবার জন্য আমার মনে দারুণ যন্ত্রণা। আমি এত কাঁদলাম যে দেবদূতরা রেগে আমাকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে দিল, উয়েদারিং হাইটসের জলাভূমির উপরে। জেগে উঠে সে কি আনন্দ আমার। হীথক্লিফকে বিয়ে আমি করতাম যদি সবাই তাকে অবজ্ঞার চোখে না দেখতো। ওকে বিয়ে করলে লোকের কাছে আমি ছোট হয়ে যাবো। কিন্তু ওতো জানবে না আমি কত ভালোবাসি ওকে। হীথক্লিফ আমার আত্মার দোসর, আমার দ্বিতীয় সত্তা। ওকে ছেড়ে কি আমি বাঁচতে পারি!"

হীথক্লিফ ঘরের বাইরেই বেঞ্চে এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। ক্যাথারিন পেছন ফিরে থাকায় দেখতে পায়নি। ক্যাথারিনের সব কথাই তার কানে যাচ্ছিল। যখন কাথারিন বললো, হীথক্লিফকে বিয়ে করলে সে ছোট হয়ে যাবে, আর সে কিছু শুনতে পারলোনা। চট করে উঠে চলে গেল। ক্যাথারিন তাকে যে কতখানি ভালোও বাসে সেটা আর তার শোনা হলোনা। সে উঠে যাবার সময় নেলীর নজরে পড়লো। চমকে উঠে সে ক্যাথারিনকে চুপ করতে বললো। হীথক্লিফ যে তার কথা শুনেছে সেটা না বলে বললো হীথক্লিফ হয়তো এসে পড়তে পারে, কাজেই এসব আলোচনা এখন না করাই ভালো।

"না, না, হীথক্লিফ আমাদের কথা শোনবার চেষ্টা করবে না।" ক্যাথারিন বললো, "আর ভালোবাসার কথা ওতো বোঝেই না।"

হীথক্লিফকে হারানোর দুঃখ ক্যাথারিন কি করে সইবে নেলী জানতে চাইলো। হীথক্লিফই বা একসঙ্গে বন্ধু, ভালোবাসা, সব হারিয়ে পরিত্যক্ত জীবন কি ভাবে কাটাবে?

ক্যাথারিন আবেগের সঙ্গে বলে উঠলো—"হীথক্লিফ পরিত্যক্ত! আমাদের বিচ্ছেদ! কে বিচ্ছেদ ঘটাবে? মানুষের সে সাধ্য নেই। হীথক্লিফকে পরিত্যাগ করলে লিণ্টনও আমার কাছে অর্থহীন। এতখানি দাম দিতে যদি হয় আমি লিণ্টনকে বিয়ে করবো না। কিন্তু হীথক্লিফকে বিয়ে করলে আমি তাকে স্বাধীনভাবে থাকতে সাহায্য করতে পারবো।······হীথক্লিফের মধ্যেই আমার জীবন, আমার সত্তা। হীথক্লিফের প্রতি আমার প্রেম পাহাড়ের মতোই সুদৃঢ়। আমি নিজেই যেন হীথক্লিফ। আমার মনের মধ্যে চির বর্তমান সে। আনন্দরূপে নয়, আমারই সত্তারূপে···।"

হীথক্লিফের দেখা আর মিললো না। ক্যাথারিন উতলা হয়ে জায়গায় জায়গায় লোক পাঠালো কিন্তু কেউ তার খোঁজ আনতে পারলোনা। ক্যাথারিন ধৈর্য হারিয়ে পাগলের মতো রাগারাগি, গালাগালি আরম্ভ করে দিল। তারপর ঝড়, জল, শীত উপেক্ষা করে বাইরে ঠায় বসে রইলো তার প্রতীক্ষায়। কেউ তাকে নড়াতে পারলোনা। ভোরের দিকে ভিজে মাথায়, ভিজে পোষাকে সে ভিতরে এসে চেয়ারে বসলো। গায়ে তখন তার জ্বর। হিণ্ডলে এসে দেখে বকাবকি করে তাকে শুতে পাঠালো। দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করলো ক্যাথারিন। সাধারণ অসুখ নয়। পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ। অনেক চেষ্টায় সুস্থ হলেও মেজাজ আরো বিগড়ে রইলো। অকারণে রাগ, চেঁচামেচি, কান্নাকাটি লেগেই থাকতো। ডাক্তারের কড়া নির্দেশ কেউ যেন তার বিরক্তি উৎপাদন না করে। এমন কি হিণ্ডলে পর্যন্ত তাকে মেজাজ দেখানো বন্ধ করলো। এইভাবেই দিন কাটতে লাগলো, কিন্তু হীথক্লিফের কোনো সন্ধান মিললো না।

বছর তিনেক এভাবে কাটার পর এডগারের সঙ্গেই ক্যাথারিনের বিয়ে হলো। নেলীকে একরকম জোর করেই ক্যাথারিনের সঙ্গে থ্রাশ-ক্রসে পাঠালো হিণ্ডলে। হেয়ারটনকে শিশু থেকে মানুষ করে তাকে ছেড়ে যেতে নেলীর খুবই কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু যেতে তাকে হলোই।

তিন

বিয়ের পর ক্যাথারিনের স্বভাবের আশ্চর্য বদল দেখা গেল। এডগারের প্রতি সে অত্যন্ত মনোযোগী, ইসাবেলার সঙ্গে তার পরম বন্ধুত্ব। মেজাজ আর সে রকম উগ্র নেই। ওরাও তার সুখ-সুবিধার দিকে প্রখর নজর রাখতো। কাজেই ক্যাথারিনের তরফ থেকেও অভিযোগ করার কিছুই রইলোনা।

এই সময়ে একদিন আকস্মিকভাবে হীথক্লিফের সঙ্গে নেলীর দেখা হয়ে গেল। তাকে দেখেতো নেলী অবাক। তার চেহারা হয়েছে আরো লম্বা চওড়া এবং স্বাস্থ্য আরো উজ্জ্বল। সাজ-সজ্জায় দুরন্ত, মুখ চোখে মর্যাদার ভাব। হীথক্লিফ নেলীকে অনুরোধ জানালো ক্যাথারিনের সঙ্গে একটিবার দেখা করিয়ে দিতে। নেলী ঘোরতর আপত্তি জানালো। ক্যাথারিন সবে সাংঘাতিক অসুখ থেকে উঠেছে। হঠাৎ হীথক্লিফকে দেখলে তার আবার সব গোলমাল হয়ে যাবে। হীথক্লিফ কিন্তু নাছোড়বান্দা, দেখা না করে সে এক পাও নড়বে না। শেষটায় রাজী হয়ে নেলী খবর দিতে রাজি হলো। এডগার আর ক্যাথারিন বসে গল্প করছে ঘরে। কে একজন ক্যাথারিনের সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে সে নিচে নেমে গেল, একটু পরেই ফিরে এসে উত্তেজিত ভাবে খবর দিল যে হীথক্লিফ এসেছে! উপরের ঘরে তাকে আনতে এডগার আপত্তি করা সত্ত্বেও ক্যাথারিন তাকে উপরেই নিয়ে এল। ক্যাথারিনের বাড়াবাড়ি উচ্ছ্বাসে এডগার খুবই বিরক্তি বোধ করছিল কিন্তু ক্যাথারিনের সেদিকে খেয়ালই ছিলনা। হীথক্লিফকে জড়িয়ে ধরে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সে অস্থির। হীথক্লিফের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্যাথারিন বলতে লাগলো, "একি স্বপ্ন? আবার তোমাকে দেখছি, ছুঁতে পারছি, কথা বলছি। কিন্তু হীথক্লিফ এ অভ্যর্থনার তুমি যোগ্য নও।" ক্যাথারিন অভিমান ভরে আবার বললো।

"তুমি নিষ্ঠুরের মতো তিন তিনটি বছর আমাকে ফেলে পালিয়েছিলে; একটুও আমার কথা তোমার মনে পড়েনি।"

মৃদু কণ্ঠে হীথক্লিফ বললো—"তোমার চাইতে আমি বেশি ভেবেছি। আর তো আমাকে তাড়িয়ে দেবেনা? অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, সে শুধু তোমার জন্যই।"

হীথক্লিফের কাছে জানা গেল সে এখন উয়েদারিং হাইটসেই থাকবে। হিণ্ডলে তাকে থাকতে বলছে। নেলীর শুনেই মনে হলো নিশ্চয়ই হীথক্লিফের মৎলব হিণ্ডলের ক্ষতি করা। নইলে উয়েদারিং হাইটসে কেন? শোনা গেল হিণ্ডলে জুয়াখেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে এবং তাকে টাকার যোগান দিচ্ছে হীথক্লিফ। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই হীথক্লিফ ক্যাথারিনকে দেখতে আসে। এডগার পছন্দ না করলেও ক্যাথারিনের জন্য সেটা মেনে নেয়। এদিকে হীথক্লিফের যাতায়াতের ফলে ইসাবেলা ক্রমে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। মেরুদণ্ডহীন ভীরু এডগারকে হীথক্লিফ যেমন ঘৃণা করে, তেমনি ঘৃণা করে ইসাবেলাকে। তার প্রতি ইসাবেলার প্রেমের কথা জানতে পেরে প্রথমে তার রাগ হলো। কিন্তু যখন জানলো ইসাবেলা প্রচুর সম্পত্তির মালিক হবে, সে ভাবলো এবার এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। এডগারের উপর শোধ নেওয়াও হবে, আবার অনেক টাকাও হাতে আসবে। ক্যাথারিন ইসাবেলাকে অনেক বোঝালো। হীথক্লিফকে সে যতটা জানে ততটা তো আর কেউ জানে না। হীথক্লিফের মনোবৃত্তি নীচ, সে অশিক্ষিত, স্বার্থপর, লোভী। তাকে বিয়ে করলে সারা জীবন কষ্ট পাবে ইসাবেলা। কিন্তু কিছুতেই ফল হলো না। হীথক্লিফ ও ইসাবেলাকে প্রেমের ভাণ করে আরো প্রলুব্ধ করলো তাকে।

ইতিমধ্যে নেলী একদিন উয়েদারিং হাইটসে গিয়ে হেয়ারটনকে দেখে বিস্মিত হলো। লেখাপড়া সে একটুও শিখছেনা। রাজ্যের নোংরা অশ্লীল কথা তার মুখে। তার কাছেই শুনলো যে হীথক্লিফ তাকে লেখাপড়া ছাড়িয়ে এই সব শেখাচ্ছে। হীথক্লীফের প্রতি কিন্তু হেয়ারটনের অদ্ভুত টান দেখা গেল। মদে চুর হয়ে থেকে হিণ্ডলে বাড়ির কোথায় কি আছে, কে কি করছে কিছুই খোঁজ রাখেনা। আর সব কিছুর মতো হেয়ারটনও এখন হীথক্লিফের দখলে।

একদিন বাগানে হীথক্লিফ ইসাবেলাকে চুম্বন করছে দেখে ক্যাথারিন খুব চটে গেল। হীথক্লিফও মেজাজ গরম করে বললো—"নিজে কি ব্যবহার করেছ আমার সঙ্গে সে খেয়াল আছে? আমি তা বুঝিনি যদি ভেবে থাকো তবে তুমি একটি মহামূর্খ। তোমার দুটো মিষ্টি কথায় আমাকে ভুলিয়ে রাখবে তা ভেবো না। আমি এর শোধ নেবোই। ইসাবেলার গোপন প্রেম আমাকে বলে ভালো করেছ। আমি এর সদ্ব্যবহার করবো। তোমাকে অবশ্য আমি কিছু বলবোনা। কিন্তু আর কেউই আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। তুমি দয়া করে আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও।" গোলমাল শুনে এডগার সেখানে চলে এল। ব্যাপার দেখে ক্যাথারিনকে সে প্রথমে ভৎর্সনা করলো হীথক্লিফের মতো একজন লোকের কটুকথা দাঁড়িয়ে শুনছে বলে। শোভনতা অশোভনতার জ্ঞানও কি সে ভুলে গেছে? ক্যাথারিন অমনি এডগারের উপর রেগে উঠলো—"তুমি কি আমাদের কথা আড়ি পেতে শুনছিলে লিণ্টন?" হীথক্লিফ হেসে উঠলো। এডগার বেশ সংযত ভাবেই তাকে বললো যে এতদিন হীথক্লিফকে সহ্য করেছে এডগার শুধু ক্যাথারিনের দিকে তাকিয়ে। তার মতো লোকের উপস্থিতিই ভালো লোককে খারাপ ও বিষাক্ত করে তোলে। অতএব এই মুহূর্তে তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। সময় মাত্র তিন মিনিট। না গেলে হীথক্লিফকে এর ফল ভোগ করতে হবে।

হীথক্লিফ লিণ্টনের আপাদমস্তক লক্ষ করতে করতে বললো, "ক্যাথি, তোমার পোষা ভেড়াটা আমার সঙ্গে লড়তে চায়। ওহে লিণ্টন, আমার সঙ্গে লড়বার যোগ্যতা আছে তোমার?" আরো অনেক অপমানকর কথা হীথক্লিফ বলে চললো। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে এডগার হীথক্লিফকে প্রচণ্ড এক ঘুঁষি লাগালো। তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল। হীথক্লিফও ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সেদিন চলে এল। ক্যাথারিন বিচলিত ও উত্তেজিত অবস্থায় উপরে এল। মাথার মধ্যে তার দপ দপ করছে। সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। হীথক্লিফকে সে

যদি আবার হারায় তার বেঁচে থেকে লাভ কি? এডগার এমন নীচ, এমন ঈর্ষাকাতর? কি ভাবে এখন লিণ্টনকে শাস্তি দেওয়া যায় সেই চিন্তাই শুধু ক্যাথারিনের মনে। এডগার তার কাছে এসে বেশ শান্ত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলো "আমি এক্ষুণি চলে যাবো, শুধু একটি কথা জানতে চাই, তুমি আমাকে চাও না হীথক্লিফকে চাও?" হিষ্টিরিয়া রোগীর মতো ক্যাথারিন চেঁচিয়ে উঠলো—"আমি শুধু একা থাকতে চাই। দেখছো না আমি দাঁড়াতেও পারছিনে।" কিছু না খেয়ে ঐ ভাবে তিনদিন কাটালো ক্যাথারিন। এডগার বিরক্ত হয়ে খোঁজও নিলনা। ক্যাথারিনের মধ্যে দেখা দিল আগের সেই পাগলামির লক্ষণ। কখনো কাঁদছে, কখনো হাসছে, কখনো বা বালিশ টুকরো টুকরো করে ঘরময় ছড়াচ্ছে, কখনো এলোমেলো বকছে। কোনো কোনো সময় তার মনে হচ্ছে সে উয়েদারিং হাইটসেই রয়েছে, সেই ছেলেবেলার মতো।

অবস্থা দেখে নেলী এবার এডগারকে খবর দিল। এডগার খুব দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লো। কেন তাকে আগে জানায়নি, এজন্য নেলীকে তিরস্কার করলো। ক্যাথারিনের পাশে বসে তার হাত দু খানি ধরে এডগার বললো "ক্যাথি, এ তুমি কি করলে? আমি কি তোমার কেউ নই? ঐ হীথক্লিফটাকে তুমি এমন ভালোবাসো যে···," "চুপ করো", ক্যাথারিন ধমকে উঠলো, "ঐ নাম যদি আরেকবার উচ্চারণ করো আমি জানলা দিয়ে লাফিয়ে সব শেষ করে দেবো। আমাকে ছোঁওয়ার আগেই আমি চলে যাবো। আমার দেহটাকে পাবে কিন্তু আমার আত্মা থাকবে ঐ পাহাড়ের চূড়ায়।"

ক্যাথারিনের অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চললো। ডাক্তার পর্যন্ত আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। এই আসন্ন বিপদের মুখে ইসাবেলা হীথক্লিফের সঙ্গে পালিয়ে গেল। এডগার শুনে বললো ইসাবেলা যেখানে স্ব-ইচ্ছায় চলে গেছে, সেখানে কিছু বলবার নেই; কিন্তু তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক এডগারের থাকবে না। ক্যাথারিনের সেবা যত্নের ভার এডগার নিজের হাতে তুলে নিল। ক্রমশ

ক্যাথারিন সুস্থ হতে থাকলো। রোগশীর্ণ দুর্বল ক্যাথারিনের মন এখন উয়েদারিং হাইটসে সর্বদা ঘোরে। সেখানে আর একটিবার যাবার জন্য সে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। ক্যাথারিন অন্তঃসত্ত্বা; তাই খুব সাবধানে, যত্নের সঙ্গে তার দেখাশুনা করে নেলী এবং এডগার।

ইসাবেলা চলে যাবার দেড় মাস পরে নেলীর কাছে তার একটি চিঠি এল। চিঠিটি অত্যন্ত গোপন, কাউকে বলা নিষেধ। চিঠিতে ইসাবেলা তার দুর্দশার করুণ বর্ণনা দিয়েছে। বিয়ের পরই সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। হীথক্লিফের আসল পরিচয়ে সে স্তম্ভিত। হীথক্লিফ কি মানুষ? মানুষ হলে সে উন্মাদ। নাকি সে শয়তান? তার নিত্য নতুন অত্যাচার ও নির্মম ব্যবহারে ইসাবেলা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। হীথক্লিফকে ইসাবেলা এখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে। নেলীকে একবার সে দেখতে চায়। পারলে অবশ্য সে যেন আসে।

উয়েদারিং হাইটসে গিয়ে ইসাবেলার চিঠির সত্যতা বুঝতে নেলীর একটুও দেরি হলো না। ইসাবেলার চরম লাঞ্ছনা দেখে তার মনে খুব আঘাত লাগলো। হীথক্লিফ নেলীকে দেখেই ক্যাথারিনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলো ও দেখা করবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। নেলী তাকে বিশেষভাবে বারণ করলো। ক্যাথারিনের বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় যেকোনো উত্তেজনা যে মারাত্মক সেটা বার বার করে বললেও হীথক্লিফ শুনতে রাজি হলো না। তার বক্তব্য ক্যাথারিন একমাত্র তাকেই ভালোবাসে। এডগার তার কাছে কিছুই নয়। ক্যাথারিনকে হারালে হীথক্লিফেরও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না পৃথিবীতে। দেখা করার জন্য ক্যাথারিনের অনুমতি আনতে নেলা রাজি না হলে, হীথক্লিফ জানালো, যে করেই হোক সে দেখা করবেই। অগত্যা নেলী ক্যাথারিনকে লেখা হীথক্লিফের একটি চিঠি নিয়ে যেতে রাজি হলো।

চার

কয়েক দিন পরে এডগারের অনুপস্থিতির সুযোগে ক্যাথারিনকে চিঠিখানা নেলী দিল। চিঠিটা নিয়ে ক্যাথারিন উদাসভাবে চুপ করে বসেই রইলো। ব্যাপারটা জানবার কোনো আগ্রহই যেন তার নেই। শেষে নেলী যখন বললো ওটা হীথক্লিফের চিঠি তখন ক্যাথারিনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চিঠিটা সে পড়লো কিন্তু মর্মার্থ ভালোভাবে যেন মাথায় ঢুকলো না। সে নেলীর দিকে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

ঠিক সেই সময় সেঘরে ঢুকলো হীথক্লিফ স্বয়ং। অপেক্ষা করে করে সে ক্লান্ত। আজ বাড়ির সদর দরজা খোলা দেখে সে আর লোভ সামলাতে পারেনি। সোজা চলে এসেছে। ক্যাথারিনের শীর্ণ দেহ দু-হাতে জড়িয়ে হীথক্লিফ তাকে ক্রমাগত চুম্বন করে চললো। তারপর ক্যাথারিন যখন প্রতিচুম্বন করলো তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে হীথক্লিফ চমকে উঠলো। সে মুখে মৃত্যুর ছায়া। হীথক্লিফের মুখে ফুটে উঠলো বেদনা ও যন্ত্রণার চিহ্ন। রুদ্ধ কণ্ঠে সে শুধু বলতে পারলো—"ওঃ ক্যাথি, আমার জীবন সর্বস্ব, এ আমি কি করে সইবো?"

ভুরু কুঁচকে ক্যাথারিন বলে উঠলো, "এখন বললে আর কি হবে? এডগার আর তুমি দুজনে মিলে আমার মন ভেঙে দিয়েছ। অথচ দুজনেই এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন কষ্টই তোমাদেরই, যেন আমারই উচিত তোমাদের প্রতি দয়া দেখানো। না, আমি তা দেখাবো না। আমাকে মেরে ফেলে তোমরা তো বেশ আনন্দেই আছ। স্বাস্থ্যও ভালো হয়েছে। আমি মারা যাওয়ার পর তুমি আরও কতদিন বাঁচবে হীথক্লিফ?" নতজানু হয়ে হীথক্লিফ ক্যাথারিনকে আলিঙ্গন করেছিল। উঠতে যেতেই ক্যাথারিন তার চুলের গোছা মুঠোয় ধরে বললো—"এমনি করে সারাজীবন তোমাকে যদি ধরে রাখতে পারতাম! তুমি কষ্ট পেয়েছ? তাতে আমার কিছু যায় আসে

।। কষ্ট আমি পাইনি? আমি মারা গেলে তুমি কি আমাকে ভুলে যাবে? অনেকদিন পর—ধরো কুড়ি বছর—হয়তো বলবে এটা ক্যাথারিন আর্নশর কবর। একদিন আমি ওকে ভালোবাসতাম, হারিয়ে দুঃখও পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন? মরলে ওর কাছে যাবো বলে আমার আনন্দ হয় না। বরং আমার স্ত্রী পুত্রদের ছেড়ে যাবো বলে দুঃখই হয়।"

ক্যাথারিনের চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। হীথক্লিফকে সে কিছুতেই ছাড়বে না। হীথক্লিফ ক্যাথারিনের হাত এত জোরে ধরলো যে নীল দাগ হয়ে গেল। সে বললো ক্যাথারিনকে নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে। নইলে এমন কথা বলে, তাকে কষ্ট দিচ্ছে কেন? কথাগুলো যে সব মিথ্যে সে তো ক্যাথারিন জানে, তবে কেন নিষ্ঠুরের মতো তার মনে আঘাত দিচ্ছে?

ক্যাথারিন বললো তার মতো দুঃখ যন্ত্রণা হীথক্লিফ পাক তা সে চায় না। সে শুধু চায় হীথক্লিফের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ না ঘটুক। "এসো হীথক্লিফ। আমার কাছে এসো, রাগ কোরো না।" হীথক্লিফ সরে গিয়ে আগুনের পাশে দাঁড়ালো। ক্যাথারিন তখন নেলীকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো, "আমার মৃত্যুর আগে ও একটুও নরম হবে না। এই তো ওর ভালোবাসার বড়াই। আমিও বলবো ও আমার হীথক্লিফ নয়। আমি যে হীথক্লিফকে ভালোবাসি সে আছে আমার মনের মধ্যে। আমি তাকে নিয়ে যাবো আমার সঙ্গে। —এসো হীথক্লিফ, আর রাগ কোরো না। আমার কাছে একবারটি এসো।" আবেগের আতিশয্যে ক্যাথারিন চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেল। হীথক্লিফ তাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো। মনে হলো ক্যাথারিন বোধহয় সে আলিঙ্গন থেকে জীবনে ছাড়া পাবে না। ঐভাবে তাকে নিয়ে হীথক্লিফ বসলো। ক্যাথারিনকে দেখে মনে হচ্ছে তার জ্ঞান নেই। কিন্তু সেও দুহাতে আঁকড়ে ধরে আছে হীথক্লিফকে। পাগলের মতো তাকে আদর করতে করতে হীথক্লিফ বলে চললো:

"আমাকে ঘৃণা করার উপযুক্ত ফলই পেয়েছ তুমি। এখন তুমি যত আদরই করো, আর আমি যত আদরই করি, দোষ তাতে কাটবে না। আমাকে যদি ভালোই বাসো কি অধিকার ছিল ছেড়ে যাবার? জবাব দাও। কি অধিকার ছিল? তুমি নিজের হাতে না ঘটালে কারো সাধ্য ছিল না আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তোমার হৃদয়কে আমি ভাঙিনি, ভেঙেছ তুমি নিজে। আর সেই সঙ্গে আমারটাও ভেঙেছ।"

ফোঁপাতে ফোঁপাতে ক্যাথারিন বললো, "আমাকে ছেড়ে দাও; আমি অন্যায় করেছি। সেজন্য মরতে বসেছি তাই কি যথেষ্ট নয়? তুমিও তো আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলে। আর তোমাকে সেজন্য বকবো না, ক্ষমা করবো। তুমিও আমাকে ক্ষমা করো।"

"তোমার ঐ চোখের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা করা সোজা নয়। কিন্তু তবু আমি ক্ষমা করলাম।"

দুজনেই নীরব; শুধু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। এডগারের আসবার সময় হলো। হীথক্লিফ ক্যাথারিনের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে কবতে বললো, "ক্যাথি আমি যাই। কাছাকাছিই থাকবো, আবার আসবো।" আরো দৃঢ়ভাবে তাকে আঁকড়ে ক্যাথারিন বললো, "না, তুমি কিছুতেই চলে যাবে না।"

"এক ঘণ্টার জন্য।"

"এক মিনিটের জন্যও নয়।"

"লিণ্টন এসে পড়বে, আমি যাই।"

ক্যাথারিন চিৎকার করে উঠলো, "না, না, না; যেও না। এই তো শেষবারের মতো। এডগার কিচ্ছু বলবে না। হীথক্লিফ, আমি মরে যাচ্ছি।"

"ক্যাথি চুপ করো, চুপ করো। আমি থাকছি। এডগার আমাকে গুলি করে মারলেও আমি হাসি মুখেই মরবো।"

এডগার ঘরে যখন ঢুকলো ক্যাথারিনের হাত শিথিল হয়ে পড়েছে, মাথাটাও ঝুলে পড়েছে। মৃতপ্রায় ক্যাথারিনকে এডগারের হাতে

তুলে দিয়ে হীথক্লিফ বললো, "আগে একে দেখো, পরে আমার সঙ্গে কথা বোলো। আমি বাইরেই থাকবো।"

ক্যাথারিনের জ্ঞান ফিরলেও কাউকে সে আর চিনতে পারলোনা। নেলী তখন হীথক্লিফকে চলে যেতে বললো। ক্যাথারিন কেমন থাকে সকালে খবর দেবে। হীথক্লিফ বললো সে বাগানে গাছের তলায় অপেক্ষা করবে। নেলী যদি সকালে খবর না দেয় তাহলে লিন্টন থাকুক বা না থাকুক সে নিজেই খবর নিতে বাড়িতে আসবে।

সেই রাত্রেই সাতমাসে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করে ক্যাথারিন মারা গেল। নেলী যখন হীথক্লিফকে খবর দিতে গেল সে বললো— "আমি জানি ক্যাথারিন মারা গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিথ্যেকথা বললো সে? কোথায় গেল? বলেছিল, আমার দুর্দশা সে গ্রাহ্য করে না। আমারও একটিমাত্র প্রার্থনা আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারও বিশ্রাম নেই। তুমি বলেছিলে আমি তোমাকে মেরে ফেলেছি। তাহলে আমাকে দেখা দাও। যে কোনো আকার ধারণ করে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকো। শুধু এই নরকে আমাকে ফেলে যেওনা। হায় ভগবান, আমার জীবনই যদি চলে গেল আমি বাঁচবো কি করে?"

ইসাবেলার উপর অত্যাচার আরো বাড়িয়ে তুললো হীথক্লিফ। তার এখন একমাত্র উদ্দেশ্য দুই পরিবারের উচ্ছেদ সাধন। হিণ্ডলে এখন তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত। মদ ও জুয়ায় অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে একদিন সে মারা গেল। দেনার দায়ে সব কিছু তার হীথক্লিফের কাছে বাঁধা। হিণ্ডলে মারা গেলে হীথক্লিফ বিষয় সম্পত্তির মালিক হয়ে উয়েদারিং হাইটসে জাঁকিয়ে বসলো। হেয়ারটন তার বাবার বাড়িতে অসহায়, পরনির্ভর হয়ে রইলো। তাকে হীথক্লিফ আগেই লেখাপড়া ছাড়িয়েছে, এখন তাকে মজুরের কাজে লাগিয়ে দিল। সে হিণ্ডলের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছে তার সেই শোধ সে তুলতে চায়, হেয়ারটন বুঝতেও পারলোনা কি পরিমাণ তাকে ঠকালো হীথক্লিফ। বরং হীথক্লিফকেই সে তার একমাত্র বন্ধু বলে জানলো।

অপমান আর অত্যাচার সইতে না পেরে সন্তানসম্ভবা ইসাবেলা বাধ্য হলো পালিয়ে যেতে। লণ্ডনের কাছেই একটা জায়গায় সে গোপনে থাকতে লাগলো। কিছুদিন বাদে তার একটি ছেলে হলো। তার নাম রাখা হলো লিণ্টন। লিণ্টন জন্ম থেকেই রোগা আর খিটখিটে স্বভাবের। হীথক্লিফ অবশ্য ইসাবেলার আস্তানার খবর পেয়েছিল; ছেলে হওয়ার খবরও সে জানতো। কিন্তু আপাতত সে ওদিকে আর নজর দেবেনা। তবে ভবিষ্যতে ছেলের দখল সে ছাড়বে না, এ আভাস সবাইকে দিয়েছিল। কারণ ছেলে নেই বলে এডগারের বিষয় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ মালিক হবে ইসাবেলার ছেলে।

লিণ্টন জন্মানোর বারো বছর পর ইসাবেলা মারা গেলে তার অনুরোধক্রমেই এডগার লিণ্টনকে নিজের কাছে নিয়ে এল। ক্যাথারিনের মেয়ে লিণ্টনের প্রায় সমবয়সী। তার নামও ক্যাথারিন। এডগার তাকে ডাকে ক্যাথি বলে। একমুহূর্ত চোখের আড়াল করেনা। লিণ্টনকে খেলার সঙ্গী পাবে বলে ক্যাথির খুব আনন্দ। কিন্তু পর দিনই হীথক্লিফ লোক পাঠালো লিণ্টনকে নিয়ে যেতে। সে সেদিন ক্লান্ত বলে তারপরদিন এডগার লিণ্টনকে পাঠিয়ে দিল উয়েদারিং হাইটসে।

ক্যাথিকে কেউ কোনোদিন উয়েদারিং হাইটসের অস্তিত্বের কথা বলেনি। একা তাকে বেরোতেও দেওয়া হতো না। হয় এডগার অথবা নেলী তাকে বেড়াতে নিয়ে যেত। একদিন নেলীর সঙ্গে বেরিয়ে সে তাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর একা একা গিয়ে উয়েদারিং হাইটস আবিষ্কার করলো। সেখানে গিয়ে লিণ্টনকে সে দেখতে পেল এবং হেয়ারটনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথাও জানতে পারলো। হেয়ারটনকে অবশ্য তার ভালো লাগেনি, কিন্তু লিণ্টনকে দেখে তার খুব আনন্দ হলো। হীথক্লিফের সঙ্গে বাড়িতে ঢোকার আগেই তার পরিচয় হয়েছিল। নেলী তাকে খুঁজতে এসে উয়েদারিং হাইটসে দেখে চমকে গেল। ফেরার পথে ক্যাথিকে নিষেধ করলো এডগারকে কোনো কথা না বলতে। ক্যাথি কিন্তু আনন্দের চোটে বাবাকে সব বলে ফেললো। এডগার তাকে বুঝিয়ে ওভাবে যেতে নিষেধ করলো। হীথক্লিফের প্রকৃতি ও আচার

আচরণ সম্বন্ধেও মোটামুটি তাকে আভাস দিলো। ক্যাথি বাবাকে কথা দিল উয়েদারিং হাইটসে আর যাবে না বা সেখানকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। কিন্তু লিণ্টনের জন্য তার খুব মনে কষ্ট হতে লাগলো। গোপনে কিছুদিন চিঠির আদানপ্রদান সে করলো। কিন্তু নেলীর কাছে একদিন ধরা পড়ায় সেটাও বন্ধ করে দিতে হলো।

হীথক্লিফ লিণ্টনকে প্রথম থেকেই অপছন্দ করে। লিণ্টনবংশের মেয়ে ইসাবেলার ছেলে সেই তার একমাত্র অপরাধ। লিণ্টনদের মতোই ভীরু ও দুর্বলচিত্ত সে। তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থা করে দিলেও সে তাকে বাড়ির মধ্যে নজরবন্দী করে রাখলো। কোথাও যাবার তার হুকুম ছিলনা।

মাস দুই তিন পরে বেড়াতে বেড়াতে আবার ক্যাথি উয়েদারিং হাইটসের সীমানায় গিয়ে পড়ে। হীথক্লিফের সঙ্গে সেখানে তার আবার দেখা হয়। হীথক্লিফ অভিযোগের সুরে ক্যাথিকে বললো লিণ্টনকে নিয়ে তার এই প্রেমের খেলায় লিণ্টন প্রায় মরতে বসেছে। ক্যাথি ক্লান্ত হয়ে এখন সরে পড়েছে। কিন্তু লিণ্টনের ভালোবাসা এতই গভীর যে তার আর ফেরার সাধ্য নেই। ক্যাথি অবিলম্বে তার কাছে না গেলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এই কথায় ক্যাথি এত কাতর ও উতলা হয়ে পড়লো যে তাকে উয়েদারিং হাইটসে না নিয়ে গিয়ে নেলীর উপায় রইলো না। এরপর থেকে এডগারের অজ্ঞাতে প্রায়ই সে উয়েদারিং হাইটসে যেতে আরম্ভ করলো। হেয়ারটনের মূর্খতা নিয়ে ক্যাথি প্রায়ই উপহাস করে দেখে নেলী মনে আঘাত পেয়ে ক্যাথিকে মৃদু ভর্ৎসনা করলো। হেয়ারটন এদিকে লিণ্টনের প্রতি ক্যাথির পক্ষপাত দেখে ঈর্ষা বোধ করতে লাগলো। প্রায়ই লিণ্টনের সঙ্গে কলহ, বাদবিসম্বাদ শুরু করে দিল হেয়ারটন।

ক্যাথির উয়েদারিং হাইটসে গোপন অভিসারের কথা জানতে পেরে এডগার তাকে আবার ভালোভাবে বুঝিয়ে বললো। তবে ক্যাথারিনকে বললো যে লিণ্টনের থ্রাশক্রসে যাবার কোনো নিষেধ নেই, চিঠিপত্র লেখারও নিষেধ নেই। লিণ্টন কিন্তু এলনা। সে অসুস্থ; অত দূর

সে আসতে পারেনা। তবে এডগারকে সে লিখে পাঠালো যদি সে অনুমতি দেয় তবে মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গায় ক্যাথির সঙ্গে দেখা করতে পারে।

পাঁচ

এডগার ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। ক্যাথারিনের জন্যই তার একমাত্র ভাবনা। অনেক চিন্তার পর তার মনে হলো লিণ্টনের সঙ্গে ক্যাথির বিয়ে হওয়াই ভালো। কিন্তু ক্যাথি বা লিণ্টনের তখনো বিয়ের বয়স হয়নি, কাজেই তাদের অপেক্ষা করতে হবে। লিণ্টনের প্রস্তাবমতো ক্যাথিকে সে তার সঙ্গে দেখা করানোর জন্য নিয়ে যেতে পারেনি। শরীর কিছু সুস্থ হলে ক্যাথিকে নিয়ে যাবে এই মর্মে সে লিণ্টনকে চিঠি দিয়েছিল। লিণ্টনের চিঠিতে দেখা যেত ক্রমশ সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। যেন এডগার চায়না ওদের দেখা হোক। এই রকম নিষ্ঠুরতায় লিণ্টন খুব ক্ষুব্ধ। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হওয়ার ব্যবস্থা না করলে লিণ্টনের মনে হবে এডগার তাকে মিথ্যে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছে। এডগার অনেক ভেবে চিন্তে নেলীর সঙ্গে একদিন ক্যাথিকে পাঠিয়ে দিল।

এডগার স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি লিণ্টনের শারীরিক অবস্থাও তারই মতো। শুধু এডগার কেন, কেউই তা ভাবেনি। তার জন্য কখনো কোনো ডাক্তারকে ডাকা হয়নি উয়েদারিং হাইটসে। লিণ্টনও সর্বদা বলতো সে ভালো আছে। সে যে হীথক্লিফের চাপে পড়ে এরকম চিঠি লিখতো বা হীথক্লিফের নির্দেশ মতো না চললে তার যে শাস্তির সীমা থাকতো না সে তথ্য তখনো কারো বোঝবার সময় আসেনি। সবাই ভাবতো অসুস্থতাবোধ লিণ্টনের একটা বাতিক। ক্যাথিকে যে হীথক্লিফের ভয়ে লিস্টন বিয়ে করতে চায় একথাটা কয়েকবার বলতে গিয়েও সে বলতে পারেনি।

লিণ্টনের সঙ্গে ক্যাথির দেখা হওয়ার নির্দিষ্ট স্থানের বদলে প্রায় উয়েদারিং হাইটসের কাছে তাদের আসতে হলো। লিণ্টন এত ক্লান্ত

যে বেশি দূর যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর আরো দু একবার ক্যাথি লিণ্টনের কাছে এল। কিন্তু তার যেন মনে হয় লিণ্টন সব ব্যাপারেই উদাসীন আর অসন্তুষ্ট। ক্যাথি এলেও যে খুব খুশি হয় তা মনে হয় না। তবু তার অবস্থা দেখে ক্যাথি না এসে পারে না। এমনিভাবে একদিন ক্যাথি লিণ্টনের কাছে এলে লিণ্টনের সহায়তায় নেলী ও ক্যাথিকে উয়েদারিং হাইটসের মধ্যে নিয়ে ফেললো হীথক্লিফ। এডগারের নিষেধ সত্বেও ক্যাথির না গিয়ে উপায় রইলো না। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হীথক্লিফ তার আসল রূপ ধারণ করলো। ক্যাথি ও লিণ্টনের বিয়ে অবিলম্বে সে দিতে চায়। কারণ এডগারের মৃত্যুর আগেই যদি লিণ্টন মারা যায় তবে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। প্রতিশোধ নেবার স্পৃহার সঙ্গে অর্থলোভ এখন প্রবল তার মনে। ছলে বলে কৌশলে সে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চায়। ক্যাথারিনের প্রতিবাদে সে তাকে প্রচণ্ড চড় মেরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, জোর করে তাদের আটকে রাখবার ভয় দেখালো। এডগারের অবস্থার কথা ভেবে ক্যাথি বললো, বিয়েতে তারও অমত নেই, তার বাবারও অমত নেই, তবে কেন এভাবে জবরদস্তি করছে হীথক্লিফ। হীথক্লিফ জানালো দেরি তার সইবে না, এক্ষুণি সে বিয়ে দিতে চায়। নেলী আর ক্যাথিকে সে-রাত্রি ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখলো হীথক্লিফ। পরদিন বিয়ের আয়োজন করে ক্যাথিকে বার করে নিয়ে গেল, কিন্তু নেলীকে মুক্তি দিল না। পাঁচ দিন ওভাবে বন্ধ থাকবার পর নেলীকে বাড়ি যেতে অনুমতি দিল, কিন্তু ক্যাথিকে নয়। হেয়ারটনের সাহায্যে কয়েকদিন পরে লিণ্টন হীথক্লিফের অজ্ঞাতে ক্যাথারিনকে থ্রাশক্রসে পালিয়ে আসতে সাহায্য করলো। ক্যাথারিন বাড়িতে আসবার পরই এডগার মারা গেল।

এডগারের বাড়িঘর, বিষয়সম্পত্তি যা লিণ্টনের প্রাপ্য ছিল সব হীথক্লিফ নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে জানা গেল। ক্যাথিকে সে জোর করে নিয়ে গেল উয়েদারিং হাইটসে, কিন্তু নেলীর যাবার

অনুমতি মিললো না। থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জ সে ভাড়া দেবে, তাই নেলীকে থাকতে হবে বাড়ি দেখাশুনা করতে।

ক্যাথারিন উয়েদারিং হাইটসে গিয়ে সোজা লিণ্টনের ঘরে চলে গেল। লিণ্টন তখন মৃত্যুশয্যায়। মুমূর্ষু লিণ্টনের জন্য একটুও সহানুভূতি মিললোনা বাড়িতে, কোনো ডাক্তারকে ডাকা হলো না। ক্যাথি একা রইলো তার মৃতদেহ আগলে। চোখের সামনে সে যেন এখন শুধু মৃত্যুকেই দেখছে। প্রায় পনরদিন এভাবে সে একা উপরের ঘরে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে রইলো। কিন্তু এভাবে একা থাকাও অসহ্য। তাই তাকে নিচে নামতে হলো। হেয়ারটন ক্যাথিকে সন্তুষ্ট করবার যথেষ্ট চেষ্টা করলেও ক্যাথি তার প্রতি বিরূপই রইলো। তার মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ক্যাথির অসহ্য মনে হয়। হেয়ারটনকে দেখলেও তার রাগ হয়। শেষে ক্যাথি এমন দুর্ব্যবহার করতে লাগলো যে হেয়ারটনের নির্বোধ মনেও তাতে আঘাত লাগলো। সে ক্যাথির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রইলো। এখন ক্যাথি কথা বলতে আসলেও সে উত্তর দেয় না, কিম্বা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই সারে। ক্যাথির মনের বদল দেখা দিল। হেয়ারটনের উদাসীনতায় তার মনে কষ্ট হতে লাগলো। তার এখন চেষ্টা কি করে হেয়ারটনের সঙ্গে আবার ভাব জমাবে। হেয়ারটনের মূর্খতা নিয়ে ক্যাথি বরাবর উপহাস করে এসেছে। এখন সংকল্প করলো সেটা শোধরাতে হবে। একা একা ওভাবে আর ক্যাথির ভালো লাগছে না। ফলে মেজাজ হয়ে উঠছে দিনের পর দিন চড়া। হীথক্লিফকেও সে এখন ভয় করে না, সুযোগ পেলেই কথা শুনিয়ে দেয়।

হেয়ারটনের কাছে ক্যাথি একখানা বই নিয়ে এসে দাঁড়ালো। "হেয়ারটন, তোমাকে এই বইটা যদি দিই তুমি নেবে?" হেয়ারটন উত্তর দিল না। বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"আচ্ছা এটা আবার আমি টেবিলের উপর রাখছি। দেখি তুমি নাও কিনা।" কিন্তু হেয়ারটন তার সংকল্পে অটল। ক্যাথি তাকে ঘৃণা করে, অপমান করে, উপহাস করে। তার সঙ্গে আর কোনো

সম্পর্ক নেই তার। শেষ পর্যন্ত ক্যাথির অধ্যবসায়ের জয় হলো। মিনতি করে, চোখের জল ফেলে সে হেয়ারটনের রাগ ভাঙাতে সক্ষম হলো। এবার ক্যাথি ঠিক করলো লেখাপড়া শিখিয়ে হেয়ারটনকে সে মানুষ করে তুলবে। হেয়ারটনকে যখন সে-কথা বলা হলো তার মুখ চোখ উজ্জ্বল দেখালো।

"হেয়ারটন, বলো আমাকে মাপ করেছ। তোমার ঐ ছোট্ট একটি কথা আমাকে কত আনন্দ দেবে তুমি জানোনা।" অব্যক্ত স্বরে হেয়ারটন কি যেন বললো বোঝা গেলনা। "আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু, কেমন?" "না, তা হতে পারেনা। আমার জন্য তোমার লজ্জা হবে সকলের কাছে। যত আমাকে জানবে, তোমার লজ্জা ততই বাড়বে। আমার তা সহ্য হবেনা।"

"তাহলে আমার বন্ধু হবেনা তুমি? আচ্ছা দেখা যাক।" তারপর চললো হেয়ারটনের শিক্ষাদান। ওদের মধ্যে অন্তরঙ্গতাও দ্রুত গড়ে উঠলো। হেয়ারটন প্রথম থেকেই ক্যাথিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। এবার ক্যাথির সহানুভূতি পেয়ে ভালোলাগা ভালোবাসায় পরিণত হলো। হেয়ারটনের সুন্দর চেহারার দীপ্তি অজ্ঞতার আড়ালে চাপা পড়ে ছিল। এখন আস্তে আস্তে সেখানে দেখা দিল বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য। ক্যাথিও এই সুন্দর তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। হেয়ারটনের মানসিক উন্নতি তাই দ্রুত এগিয়ে চললো।

হীথক্লিফের মনেরও যেন কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। নেলীকে সে থ্রাশক্রস গ্র্যাঞ্জ থেকে আনিয়েছে, কারণ ক্যাথারিনকে সর্বদা দেখে দেখে তার বিরক্তি বোধ হচ্ছে। ক্যাথি যেন এখন থেকে নেলীর সঙ্গেই থাকে, হীথক্লিফের সামনে যতটা সম্ভব না আসে। বাড়ীর মধ্যে কী না ঘটেছে সে বিষয়েও হীথক্লিফ আগের চাইতে অনেক বেশি উদাসীন ও নির্লিপ্ত। ক্যাথি-হেয়ারটনের মধ্যে যে বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তাও তার নজরে পড়েনি। হেয়ারটন যদিও হীথক্লিফকে ভয় করে, ক্যাথি হীথক্লিফকে একটুও গ্রাহ্য করেনা। একদিন জোসেফের জমির গাছ-পালা কেটে ফেলে ওরা নতুন করে গাছ পোতার তোড়জোড় করছিল।

তা দেখতে পেয়ে জোসেফ খেপে গেল এবং হীথক্লিফের কাছে গিয়ে নালিশ জানালো। হীথক্লিফ ওদের ডেকে খুব করে বকুনি দিতে গেল। আর অমনি ক্যাথি চেঁচিয়ে উঠলো, "তুমি আমার সব কিছু গ্রাস করেছ, আমি কি আমার এক টুকরো জমিও পেতে পারি না?" "তোমার জমি? তোমার কস্মিনকালেও কিছু ছিল না।" "আমার টাকা?" ক্যাথি প্রশ্ন করলো। "চুপ করো, আমার সামনে থেকে চলে যাও।" কিন্তু ক্যাথি সহজে যাবার পাত্র নয়। "আর হেয়ারটনের টাকা? তার জমি?" হীথক্লিফ জবাব দেয়, "আমি এবং হেয়ারটন এখন বন্ধু।" ক্যাথি বললো "আমি তাকে তোমার সব কথা খুলে বলবো।" হীথক্লিফ একমুহূর্ত কিছু বললোনা। উঠে দাঁড়িয়ে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। "আমাকে মারবে? মারলে হোয়ারটনও তোমাকে ছেড়ে কথা কইবেনা। ভালো চাও তো বসে পড়ো।" "হেয়ারটন যদি এই মুহূর্তে তোমাকে ঘর থেকে না তাড়ায় আমি তাকে মেরেই ফেলবো।"

"হতচ্ছাড়ি ডাইনা, কী সাহসে তুই হেয়ারটনকে আমার বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছিস? ওকে এক্ষুণি বের করে দে, হেয়ারটন, শুনছিস? নইলে ওকেও আমি মেরে ফেলবো।"

হেয়ারটন অস্ফুটস্বরে ক্যাথিকে তার সঙ্গে চলে আসতে বললো।

"জোর করে টানতে টানতে নিয়ে যা। এখনও কথা বলছিস?" হীথক্লিফ নিজেই জোর করতে উঠলো।

"ওহে বদমাইস, তোমার কথা হেয়ারটন আর শুনছেনা। আমার মতো সেও তোমাকে ঘৃণা করবে।"

হেয়ারটন বললো, "চুপ, চুপ, এভাবে ওর সঙ্গে কথা বোলোনা।"

ক্যাথি : "তাই বলে ও আমাকে মারবে, আর তুমি ওকে মারতে দেবে?"

"তবে এখান থেকে চলো।"

কিন্তু তার আগেই হীথক্লিফ ক্যাথারিনকে ধরে ফেলেছে। হেয়ারটনকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললো।

"ডাইনী, আমাকে এভাবে রাগানোর জন্য চিরকাল তোকে অনুতাপ করতে হবে।" ক্যাথির চুল ধরে টেনে তাকে যেন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে চায় হীথক্লিফ। হঠাৎ সে চুল ছেড়ে দিয়ে ক্যাথির চোখের দিকে চাইলো। হাত দিয়ে ক্যাথির চোখ দুটো সে ঢেকে রাখলো। তারপর অনেক শান্ত গলায় বললো, "এভাবে আমাকে আর রাগানোর চেষ্টা কোরো না। একদিন হয়তো মেরেই ফেলবো। যাও আমার সামনে থেকে।—আর হেয়ারটন। সে যদি ফের তোমার কথা শোনে, এ বাড়ির অন্নজল তার ঘুচলো। তোমার ভালোবাসায় সে ভিখারীতে পরিণত হবে। যাও সবাই আমার সামনে থেকে চলে যাও।"

ক্যাথি আর হেয়ারটন দুজনের চোখই অবিকল ক্যাথরিন আর্নশর মতো। সেটা লক্ষ করেই হীথক্লিফের হয়তো ভাবান্তর ঘটলো। ওদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে হীথক্লিফ সেখানে একা বসে রইলো। খাবার সময় নামমাত্র খেয়ে আবার বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে আর ফিরলো না।

যখন ফিরে এল হেয়ারটন আর ক্যাথি বসে পড়াশুনা করছিল। হেয়ারটনের হাত থেকে বইটা নিয়ে হীথক্লিফ দেখলো। তারপর নীরবে ফিরিয়ে দিল। ইঙ্গিতে ক্যাথিকে ওখান থেকে চলে যেতে বললো সে। হেয়ারটনও একটু বাদেই ক্যাথিকে অনুসরণ করলো। হীথক্লিফ নেলীকে তখন বলতে লাগলো :

"সারাজীবন ধরে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করলাম তার শেষ পরিণতি বড় করুণ তাই না? যখন দুটো বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করবার মালমশলা সব আমার যোগাড় তখন সেই ইচ্ছেটাই আমার চলে গেল! আমার শত্রুরা আমাকে হারাতে পারেনি। তাদের বংশধরদের উপর শোধ নেবার এখনই তো উপযুক্ত সময়। ইচ্ছে করলেই আমি তা পারি, কেউ বাধা দেবার নেই। কিন্তু কি হবে শোধ নিয়ে? ধ্বংস করবার আনন্দ আমি হারিয়ে ফেলেছি। নিরর্থক ধ্বংসে আর আমার রুচি নেই। আমি বুঝতে পারছি আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন

আসছে। জীবনে কোনো কিছুতে আমার আর আগ্রহ নেই এখন। এমনকি খাওয়া দাওয়াতে পর্যন্ত নয়। এঘর থেকে ঐ যে চলে গেল দুটি ছেলেমেয়ে ওদের কথাই ভাবছি এখন। কিন্তু ওদের কথা ভাবলে আমার মানসিক যন্ত্রণা বাড়ে। ক্যাথারিনের কথা আমি কিছু ভাবতেও চাইনে, বলতেও চাইনে। ও যদি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেত ভালো হতো। ওর উপস্থিতি আমাকে পাগল করে দেয়। হেয়ারটন আমাকে বিচলিত করে অন্যভাবে। ওকে দেখলে আমার অতীতের স্মৃতি বড় বেশি রকম মনে পড়ে। ও যেন আমারই যৌবনের প্রতিরূপ। তেমনি নির্যাতিত, তেমনি গর্বিত; তেমনি সুখ আর যন্ত্রণা ওর মনে। আমার সেই অমর প্রেমকেই আমি দেখছি হেয়ারটনের মধ্যে। ক্যাথরিনের সঙ্গে এত সাদৃশ্য ওর। কেবল তাই নয় পৃথিবীর সব জিনিসের মধ্যে ক্যাথরিন আমাকে ঘিরে রয়েছে। সারা পৃথিবী অহরহ আমাকে জানায় একদিন সে এখানে ছিল, এখন নেই। এখন আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি। …যাক এসব তোমাকে বলার কারণ যে তুমি বুঝবে আমি কেন একা থাকতে চাই। হেয়ারটনের সঙ্গ আমার কাছে বেদনদায়ক। সেই কারণেই তার আর ক্যাথারিনের মধ্যে যা চলছে সেদিকে আমি খেয়াল করছিনে।"

নেলী কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলো, "পরিবর্তন বলতে কি বোঝাতে চাও?" "সেটা ঠিক সময় না এলেতো বলতে পারছিনে। নিজেই পুরোটা বুঝিনি এখনো।"

"তুমি কি অসুস্থ?"

"একটুও না।"

"মৃত্যুর কথা ভেবে ভয় পাচ্ছ কি?"

"ভয়? না। ভয় পাবো কেন? যা একাগ্রচিত্তে চাইছি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে মনে হচ্ছে শীগ্‌গিরই এবার তা পাবো।"

ছয়

এর কিছুদিন পর হীথক্লিফ খাবার সময়েও সবার সঙ্গে একত্রে বসা ছেড়ে দিল। খাওয়াও তার খুবই কমে গেল। সারা দিনরাতে মাত্র

একবার নামমাত্র খাবার মুখে দিত। একদিন রাত্রে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরলো না সেদিন। পরদিন অনেক বেলা পর্যন্তও তার দেখা নেই। হঠাৎ দেখা গেল গেট দিয়ে সে ভিতরে আসছে। মুখ চোখ তার আনন্দে উজ্জল। গোটা চেহারাটাই তার যেন বদলে গেছে। সবাইকে সে সামনে থেকে সরে যেতে বললো। সে সম্পূর্ণ একা থাকতে চায়।

দুপুরে সবাই একসঙ্গে খেতে বসেছে। খাবার মুখে তুলতে গিয়ে তার আর খাওয়া হলো না। জানলার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে বাইরে চলে গেল। ফিরলো ঘণ্টা দুই পরে। মুখ চোখ তেমনি খুশিতে উজ্জল। মাঝে মাঝে আপন মনে সে হাসছে আর সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠছে। নেলীকে সে বলে দিল ক্যাথি আর হেয়ারটন তার সামনে যেন না আসে। কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। সে সে একা থাকবে।

নেলী জানতে পারলো না তার এই অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ কি? গত রাত্রে সে ছিলই বা কোথায়? হীথক্লিফ হাসতে হাসতে বললো;

"....গত রাত্রে প্রায় নরকের দরজায় গিয়েছিলাম। আর আজ স্বর্গের সীমানায়। প্রায় তিন ফুটের ব্যবধান। এখন তুমি যাও নেলী। বেশি ঔৎসুক্য যদি না দেখাও ভয় পাবার মতো কিছু দেখবে না বা শুনবে না।"

রাত্রিবেলা নেলী ঘরে খাবার আর আলো নিয়ে এল। খোলা জানলার জাফরির গায়ে হেলান দিয়ে অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হীথক্লিফ। হীথক্লিফের কাছে আসতেই তার মুখের দিকে চেয়ে নেলী চমকে উঠলো। সেই গভীর কালো চোখ, সেই হাসি। সেই রকম ফ্যাকাশে মুখ। এ যেন হীথক্লিফের প্রেতাত্মা। ভয়ে মোমবাতিটা উল্টো করে রাখতে গিয়ে পড়ে নিভে গেল। হীথক্লিফ তাকে বলল আরেকটা বাতি আনতে। নেলী এবার নিজে না গিয়ে জোসেফকে পাঠালো। সে ফিরে এসে জানালো হীথক্লিফ কিছু খাবে না, সে শুতে যাচ্ছে। নেলী বুঝতে পারলো নিজের ঘরে না গিয়ে অন্য ঘরে যাচ্ছে হীথক্লিফ, যেটা সে সব সময় বন্ধ করে রাখে।

পরদিন সে নিচে এলে কফির পেয়ালা সামনে দিল নেলী। হীথক্লিফের সেদিকে খেয়ালই নেই। সামনের দেয়ালে একটি বিশেষ জায়গার উপর তার লক্ষ্য। অস্থির, চঞ্চল চোখে উপর থেকে নিচে কি যেন দেখছে। সে জিনিসটা যেন এক জায়গায় থাকছে না। তাকে অনুসরণ করে চলেছে হীথক্লিফের দৃষ্টি।

"দেয়ালে কি দেখছো অতো? কফি যে এদিকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল।" নেলী বললো।

"চুপ, চুপ, চেঁচিয়ো না।"

নেলী বুঝলো হীথক্লিফ যাই দেখুক না কেন সেটা তার মনে আনছে একই সঙ্গে আনন্দ আর বেদনা। বহুক্ষণ এভাবে কাটিয়ে সে বাড়ির বাইরে চলে গেল। ফিরলো দুপুর রাতের পর। শোবার ঘরে না গিয়ে সে নিচের ঘরে দরজা বন্ধ করলো। নেলী শুনতে পেল হীথক্লিফের পায়চারির শব্দ। একটা চাপা আর্তনাদ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। কি যেন আপন মনে বলে চলেছে হীথক্লিফ। খেয়াল করলে বোঝা যায় ক্যাথারিনের নাম ধরে এমন স্নেহসিক্ত অথচ বেদনা মেশানো গলায় সে ডাকছে যেন ক্যাথারিন সেই ঘরেই উপস্থিত রয়েছে। সে ঘরে ঢুকে দেখতে নেলীর সাহস হলো না। সে হীথক্লিফের মনোযোগ আকৃষ্ট করবার জন্য রান্নাঘরে শব্দ করে উনুন ধরাতে আরম্ভ করলো। দরজা খুলে হীথক্লিফ বেরিয়ে এল—"নেলী এদিকে এসো। সকাল হয়েছে কি? আলোটা নিয়ে এসো।"

"চারটে বাজলো। উনুন ধরে উঠলে আমি যাবো।" হীথক্লিফ পায়চারি করতে লাগলো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার। সে বলতে লাগলো, "আমার উইল এখনো করা হয়নি। কাকে কি দেবো এখনো ঠিক করিনি। এসব যদি পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে পারতাম।" নেলী ওসব কথা রেখে খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নিতে বললো হীথক্লিফকে।

"তা যে পারছিনে সে আমার দোষ নয়। পারলেই এসব করবো। আমি খুব সুখী অথচ সুখী নই। মনের আনন্দ আমার শরীরকে নষ্ট করছে, কিন্তু তাতেও সে তৃপ্ত হচ্ছে না।"

"আনন্দ! হায় ভগবান, অদ্ভুত আনন্দ! ······জীবনে অনেক পাপ করেছ হীথক্লিফ। বাইবেল পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখোনি। কোনো পাদ্রীকে ডেকে এবার ধর্মের কথা শোনো। নইলে স্বর্গে যাবে কি করে?"

"ভালো কথা মনে করেছ নেলী। আমার মৃত্যুর পর কি করবে বলে রাখি। ছুটো কফিন যেন তৈরি করা হয়। সঙ্গে যাবে শুধু তুমি। আর যদি হেয়ারটন যেতে চায়। কোনো পাদ্রী আসবে না, কোনো মন্ত্র পাঠ নয়। তোমাকে তো বলেছি স্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমি। আর কোনো কিছুতে আমার লোভ নেই।"

বিকেলে সবাই যখন রান্নাঘরে হীথক্লিফ নেলীকে ডাকলো। নেলী বললো সে যাবেনা, তার ভয় করছে। ক্যাথির দিকে তাকিয়ে হীথক্লিফ তখন বললো—"কিগো, তুমি আসবে না কি! তোমাকে মারবোনা। না, তুমি তো আসবে না। তোমার কাছে আমি শয়তানেরও অধম। বেশ; আমার এমন একজন আছে যে আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবেনা। হায় ঈশ্বর! সে এতো নিষ্ঠুর! আমার পক্ষেও সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।" ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো হীথক্লিফ।

পরদিন সারাদিনেও সে ঘরের দরজা খুললো না। অসুস্থ হয়েছে ভেবে হেয়ারটন ডাক্তার নিয়ে এল। কিন্তু শত অনুরোধেও হীথক্লিফ দরজা খুলতে রাজি হলো না। পরদিন সন্ধ্যাবেলা জোর বৃষ্টি পড়ছে। সারারাত ধরে বৃষ্টি চললো। হীথক্লিফের ঘরে জানলা খোলা। বৃষ্টির ছাঁট খোলা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে অথচ হীথক্লিক সেটা বন্ধ করছে না দেখে সবাই ভাবলো হীথক্লিফ নিশ্চয়ই ঘরে নেই। কোনো ফাঁকে বেরিয়ে গেছে।

আরেকটা চাবি এনে দরজা খোলা হলো। দেখা গেল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হীথক্লিফ বিছানার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। দেহে তার প্রাণ নেই। যার প্রতি দারুণ অবিচার ও অন্যায় করেছে হীথক্লিফ সেই হেয়ারটন শুধু শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লো।

হীথক্লিফের ইচ্ছা অনুযায়ীই তাকে কবর দেওয়া হলো। কেউ কেউ নাকি তাকে এখনো উয়েদারিং হাইটসের আশেপাশে ঘুরতে দেখে। কখনো একা, কখনো আরেকটি মেয়ের সঙ্গে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হীথক্লিফ এতদিনে ক্যাথারিনকে পেল।

উয়েদারিং হাইটসের

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

'উয়েদারিং হাইটস' এমিলি ব্রন্টির একমাত্র উপন্যাস এবং এই একটি উপন্যাসেই সাহিত্যজগতে তাঁর স্থায়ী আসন। উপন্যাসটির প্রকাশ সে যুগে বহু বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। দুঃসাহসিক কল্পনা, সৃজনধর্মী রচনা-কৌশল ও মৌলিকত্বে সবার মনে চমক লাগলেও উপন্যাসটির স্থান, কাল, পাত্র ও কাহিনীর অভিনবত্ব সকলে খুশিমনে মেনে নিতে পারেননি। হীথক্লিফের মতো একটি বিকৃত চরিত্রের লোক ও তার বীভৎস কার্যকলাপ ঊনবিংশ শতকের পরিশীলিত রুচিকে আঘাত করেছিল। তাই শার্লট ব্রন্টির 'জেন আয়ার' সম্বন্ধে লোকে উচ্ছ্বাসিত হলেও এমিলি ব্রন্টি অনেককাল তাঁর প্রতিভার যোগ্য সম্মান পাননি! শার্লট ব্রন্টির কাহিনী গড়ে উঠেছে জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে। তাঁর উপন্যাস প্রধানত আত্মজীবনীমূলক। কাজেই অনেকটাই তিনি নির্ভর করেছেন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর। কিন্তু এমিলির লেখার উপকরণ তাঁর অন্তরের গভীর উপলব্ধি থেকে আবিষ্কৃত। এমিলির উপন্যাস ভাব, ভাষা ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে, চিরাচরিত প্রথাকে অগ্রাহ্য করে চলেছে আবেগ ও কল্পনার এমন একটি স্তরে যেখানে সাধারণ মানুষের কল্পনা সহজে পৌঁছয় না। তাই এমিলি অভিনন্দিত না হয়ে হয়েছিলেন সর্বজননিন্দিত। এমনকি শার্লট ব্রন্টিও বলেছিলেন এমন একটি উপন্যাস ছাপা না হলেই ভালো হতো। তবু প্রকৃত সমঝদার যাঁরা কিছু কিছু সম্মান দিতে তাঁরা ভোলেননি। ১৮৭৭ সালে সুইনবর্ন বলেছিলেন, 'উয়েদারিং হাইটসে'র ঝঞ্ঝা-আলোড়িত প্রতিটি পৃষ্ঠায় ধু ধু প্রান্তরের শুকনো মাটির টাটকা বুনো গন্ধ পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেছিলেন, 'উয়েদারিং হাইটসের' মতো বই সকলে পছন্দ করবে না; কিন্তু যারা করবে আর কোনো বই তাদের ভালো লাগবে না।

বর্তমান সাহিত্যবিচারে এমিলির শিল্প-নৈপুণ্যের নব মূল্যায়ন হয়েছে এবং হচ্ছে। সে বিচারে এমিলি ব্রন্টি শুধু প্রতিভাময়ী নন, তিনি অনন্যসাধারণ। যে জগৎ চেনা জানা, যে জগৎ নিয়ে অন্য সাহিত্যিকদের কারবার, এমিলি সে জগৎ থেকে অনেক দূরে। তাঁর জগৎ কল্পলোকের জগৎ, গূঢ় ধ্যানোপলব্ধির জগৎ। উনিশ শতকের কোলাহলপূর্ণ, গন্ধময় সমৃদ্ধিশালী ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর উপন্যাসের পাত্রপাত্রী নয়। এমিলির কল্পলোকের নায়ক-নায়িকার কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় একমাত্র তাঁর শৈশবের লীলাভূমি ইয়র্কশায়ারের প্রান্তরবাসীদের সঙ্গে, যাদের গায়ে সভ্যতার ছোঁয়াচ বিন্দুমাত্র লাগেনি। ব্লেকের মতো যেসব মানুষ স্থানকালের সীমানায় সঙ্কুচিত নয়, যারা সম্পর্কিত শুধু মহাজাগতিক বিশ্বের সঙ্গে, সেই আদিম মানুষ এবং তাদের কাহিনী এমিলির উপন্যাসেরও উপজীব্য বিষয়।

এমিলি সম্বন্ধে বহু সমালোচক বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। কেউ কেউ আবার প্রশংসায় মুখরিত হয়ে তাঁকে সাহিত্য-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে এমিলি শ্রেষ্ঠ না হলেও অসামান্যা। এই অসামান্যতা তাঁর মৌলিকত্বের জন্য, অভিনবত্বের জন্য। এমিলির মতো আর একটিও উপন্যাস কেউ কখনো লেখেননি। এই মৌলিকত্ব তাঁর বিষয়বস্তুতে, তাঁর বর্ণনা-ভঙ্গিতে, তাঁর জীবনদর্শনে। এই জীবনদর্শন হয়তো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই মিস্‌টিসিজমের কাছাকাছি পৌঁছেছে। জড় ও প্রাণময় জগৎ নিয়ে বিশ্বচরাচর যে একটি মৌলিক আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ, এটি এমিলি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর লেখা কয়েকটি কবিতায়ও এর আভাস পাওয়া যায়। এর একদিকে উত্তাল আলোড়ন ও সংঘাত, অপরদিকে প্রশান্তি। একদিকে এই প্রকাশ নিষ্ঠুর, কঠিন, উদ্দাম, বহমান; অন্যদিকে করুণাঘন, শান্ত, নিষ্ক্রিয়, নিস্তেজ। এই প্রকাশ আধার অনুযায়ী কখনো কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ধাবিত হয়। শান্ত ও নিষ্ক্রিয় ভাব তখন হয়ে দাঁড়ায় দুর্বলতা; উত্তাল আলোড়ন হয়ে ওঠে অশান্ত বিক্ষোভ।

এমিলির জীবনদর্শনে সাধারণ অর্থে ভালোমন্দের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সব অভিজ্ঞতাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য। এমিলির নিষ্ঠুর চরিত্রেরা চরম নিষ্ঠুর! ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তিকে তারা কখনোই সংযত করবার চেষ্টা করেনা। কিন্তু এই ধ্বংস-স্পৃহা মৌলিক প্রবৃত্তিজাত নয়। সহজ সরল স্বাভাবিক পথ থেকে দূরে সরে এসেছে বলেই এটা ধ্বংসাত্মক। মূলতঃ এরা অশুভ বা ভয়ঙ্কর নয়। থ্যাকারের মতো এমিলি মানুষকে ভালোমন্দের সংমিশ্রণে মিলিয়ে দেখেননা। শার্লট ব্রন্টির মতো এমিলির সৃষ্ট চরিত্রকে সৎ ও অসৎ এই দুই পর্যায়ে ভাগ করাও যায়না। তাঁর উপন্যাসে দ্বন্দ্ব তাই ন্যায়-অন্যায়ের সম ও বিষমের দ্বন্দ্ব। চরিত্রগুলি তাদের অন্তরের সত্যকে মেনে চলে। তাদের মনের বদল ঘটে, কিন্তু এই বদলের কারণ নীতিগত নয়! কাজেই প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই তাদের প্রাপ্য নয়। অনুভূতি ও আবেগের তীব্রতা এদের অসাধারণ। যে মৌলিক শক্তির এরা প্রতীক, *তারই মতো এরা দুর্দম, অনমনীয়; এরা পাহাড়ের মতো অপরিবর্তনীয়,* বজ্রের মতো ভয়ানক।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেও এমিলির কাছে কোনো বৈষম্য নেই। এই পৃথিবীর বুকেই আত্মার অমরতায় তিনি বিশ্বাসী। মৃত্যুর আগেও যেমন, পরেও তেমনি, বিদেহী আত্মা পৃথিবীতে তার প্রভাব বিস্তার করে চলে। এইখানেই অন্য সব লেখকদের চাইতে এমিলির বিরাট তফাৎ। তিনি যেন ভারতীয়দের মতোই বিশ্বাস করেন জীবনের বিরোধ মৃত্যুতেই শেষ নয়। যার কাছে উয়েদারিং হাইটস্ স্বর্গের চাইতেও লোভনীয় সেই ক্যাথারিন আর্নশ মৃত্যুর পর সেখানে বাসা বাঁধতে পারলো না বটে কিন্তু হীথক্লিফের উপর তার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রইলো। এইভাবে এমিলির উপন্যাসে মৃত ও জীবিত পাশাপাশি বাস করে। তাঁর অধ্যাত্মলোকের বাস্তবে প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিকে কোনো তফাৎ নেই।

'উয়েদারিং হাইটসের' প্লট জটিল। কিন্তু কাহিনীর বর্ণনায় লেখিকা অপূর্ব মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম অধ্যায়েই নাটকীয় ভাবে

রহস্য রোমাঞ্চ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে আরো কিছুর জন্য পাঠককে কৌতূহলী ও প্রস্তুত করে নিয়েছেন। হীথক্লিফ ও ক্যাথারিনের পরস্পরের প্রতি আসক্তি, ক্যাথারিনের বিশ্বাসভঙ্গ ও তার পরিণাম লকউড ও নেলী ডীনের বর্ণনার মাধ্যমে তিনি পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। কাহিনীর তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য লকউড ও নেলী ডীন উভয়কেই প্রয়োজন। একজন ঘটনার মাঝখানে, অপরজন বাইরে। লকউডের প্রথম অভিজ্ঞতায় আমরাও উয়েদারিং হাইটসের রহস্যময়তা ও তার অদ্ভুত চরিত্রের গৃহস্বামী সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হই। পাঠককে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বাদ দেবার জন্যই এমিলি তাদের নিয়ে গিয়েছেন রহস্যের খাশমহলে। অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ লকউড ও নেলী দুজনে পৃথকভাবে করেছে এবং এরা দুজনে কাহিনীর পারম্পর্য রক্ষা করেছে। কাহিনীতে তাই কোথাও অস্বাভাবিক ছেদ নেই। অবশ্য নেলী ডীনের স্মৃতিচারণাতেই প্রধান চরিত্রগুলি বেশি ভাস্বর।

উপন্যাসটিতে নাটকীয় উপাদান যথেষ্ট আছে। লেখিকার নিজস্ব কোনো মন্তব্য এখানে অনুপস্থিত। একটি দৃশ্যের পর আরেকটি দৃশ্যের অবতারণার মধ্যে চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। নির্দিষ্ট নিয়তির দিকে চরিত্রেরা দ্রুত ছুটে চলেছে। একমাত্র ইবসেন ছাড়া উনিশ শতকের আর কারো লেখায় এরকম নাটকীয়তা দেখা যায় না। ট্রাজিক রোমান্সের মতোই কেন্দ্রীয় ঘটনা মনে দাগ কেটে যায়। মনের সমস্ত আবেগ ও অনুভূতি যেন একটি ঘটনায় প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে।

প্রেম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা, লোভ ও চরম নিষ্ঠুরতা 'উয়েদারিং হাইটসের' প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্বেলিত। ঘটনা কখনো কখনো হয়তো অতি-নাটকীয়, এবং হাস্যকর। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে এটি সুন্দর এবং এমন একটি দুর্দান্ত কল্পনা সাহিত্যে সত্যিই বিরল। প্রচণ্ড আলোড়ন ও বিক্ষোভের অন্তে দেখা যায় শান্ত ও সুন্দরের আবির্ভাব। এর চরিত্রেরা নিষ্ঠুর, খল, ভয়ঙ্কর; কিন্তু তারাও মুক্ত প্রকৃতিকে ভালোবাসে, কান পেতে শোনে পাখির কলকাকলি, নদীর মর্মর।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় প্রতিশোধের জ্বলন্ত আগুন নিঃশেষিত। দুই পরিবারের শেষ দুইজন প্রতিনিধি আবার নতুন করে ভালোবাসছে, নতুন সুরে কথা বলছে, রুক্ষ জমিতে গড়ে তুলছে ফুলের সুষমা। প্রিমরোজ ফুল বয়ে আনছে প্রেম ও শান্তির বার্তা। আমরা মানুষের চিরন্তন কামনা ও চির-আবর্তিত জীবনধারা ক্যাথি ও হেয়ারটনের মধ্যেই যেন চিরপ্রবহমান দেখতে পাই।

ক্যাথারিন আর্নশ-চরিত্র—'উয়েদারিং হাইটস' ঠিক নায়িকা-প্রধান উপন্যাস না হলেও এতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যাথারিন আর্নশই তার অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করে আছে। প্রথমেই তার অদৃশ্য উপস্থিতির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই এবং শেষেও তার অদৃশ্য উপস্থিতির আভাস পাই। ক্যাথারিনের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। তার সম্বন্ধে যা কিছু আমরা জানি তা নেলী ডীনের কাছ থেকে।

গল্পের প্রথম অংশে ক্যাথারিন রাজরাজেশ্বরীর মতো অধিকার নিয়ে বসে আছে। সে সুন্দর, মেজাজী, স্বার্থপর ও খামখেয়ালী। হীথক্লিফের সঙ্গে তার চরিত্রের অদ্ভুত সমতা। সমমানসিকতা নিয়ে হীথক্লিফকে সে নিজের চাইতে বেশি ভালোবাসে। হীথক্লিফকে সে যেমন বোঝে আর কেউ তেমন বোঝে না। হীথক্লিফের দুরন্ত বন্য প্রকৃতি একমাত্র ক্যাথারিনের পক্ষেই সংযত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এডগার লিণ্টনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে অধিকার সে হারালো। হীথক্লিফের কাছ থেকে সে অনেক দূরে সরে এল। ফলে হীথক্লিফের ঘৃণাকে সে এমন ভাবে জ্বালিয়ে দিল যে দীর্ঘ সতেরো বছর ধরেও সে ঘৃণার আগুন তার মন থেকে নিভলোনা। হীথক্লিফকে গভীর ভাবে ভালোবাসলেও তার যথার্থ গুরুত্ব সম্বন্ধে ক্যাথারিনের মন সচেতন ছিল না। নেলীর কাছে সে যখন স্বীকার করছে হীথক্লিফ তার জীবনে কতখানি, তখনো এডগারকে বিয়ে করলে হীথক্লিফের কতখানি মানসিক বিপর্যয় ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে সে কিছুই ভাবছেনা। ক্যাথারিন সহজ বুদ্ধি দিয়ে ভেবেছিল এডগার এবং হীথক্লিফ দুজনকেই সে আগের মতোই বরাবর বশে রাখতে পারবে। এই দৈত

ভূমিকায় ক্যাথারিনের ভালোবাসার গভীরতা সম্বন্ধে সংশয় জাগে। কিন্তু সম্পদ, মানমর্যাদা ও সৌন্দর্যের প্রতি ক্যাথারিনের আকর্ষণ থাকলেও সে প্রতারক নয়। এডগার ও হীথক্লিফ দুজনকেই সে ভালোবাসে। কিন্তু দু'রকম ভাবে। ভালোবাসার স্বরূপ সে নিজেই উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছে। হীথক্লিফ তার আত্মার দোসর; সে ছাড়া পৃথিবী তার কাছে অর্থহীন, বিস্বাদ। এডগারের প্রেম ক্ষুদ্র পত্রস্তবকের মতো, সময়ে তা বদলে যাবে, কিন্তু হীথক্লিফের প্রেম পাহাড়ের মতো দৃঢ, অপরিবর্তনীয়। হীথক্লিফকে ছেড়ে বেঁচে থাকবার কথা ক্যাথারিন কল্পনাও করতে পারেনা। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ধনসম্পদের মোহ তার চোখে সাময়িকভাবে আবরণ টেনে দিয়েছিল। এডগারকে বিয়ে করলে অন্যায় হবে এ ধারণা তার ছিলনা। তবু অন্তর সায় দেয়নি। চপলমন কিশোরী অন্তরের গভীরতম অনুভূতিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত নিজের স্বার্থের দিকেই সে তাকিয়েছে। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝখানে হীথক্লিফের অন্তর্ধানে তার মন সহজেই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। হীথক্লিফ যে তারই অবহেলায় দারুন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তার চোখের সামনে থেকে দূরে সরে গেল তা বুঝবার মতো সূক্ষ্ম অনুভূতি তখনো তার গড়ে ওঠেনি।

হীথক্লিফ চলে যাবার পর বছর-তিনেক ক্যাথারিনকে লেখিকা অন্তরালে রেখেছেন। কারণ ক্যাথারিন-চরিত্রের পূর্ণতা ও বিকাশ হীথক্লিফকে নিয়ে। ক্যাথারিনের সঙ্গে হীথক্লিফের মনের এত নিবিড় সংযোগ যে ক্যাথারিন নিজেকেই হীথক্লিফ বলে মনে করে। তিন বছর পর এডগারের সঙ্গে বিয়ে হলে আবার যখন হীথক্লিফের আবির্ভাব ঘটেছে, ক্যাথারিনও তখন আবার আমাদের সামনে এসেছে। বিয়ের পর ক্যাথারিন বিশ্বস্ত-স্ত্রী হতেই চেষ্টা করেছে। হীথক্লিফের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগে বিবাহ বাধা হতে পারে বলে তার মনে হয়নি। কিন্তু সে মনে-না-হওয়া যে কতখানি ভুল, হীথক্লিফ আবার সামনে এলে বুঝতে তার মুহূর্ত দেরি হলোনা। এখান থেকে ক্যাথির চরিত্রে লেগেছে ট্র্যাজেডির সুর। হীথক্লিফ যে তার মনের সঙ্গে

একান্ত ভাবে জড়িয়ে আছে এবং জীবন থাকতে সে বাঁধন যে খোলা অসম্ভব এই উপলব্ধিতে তার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হয়ে উঠলো। থ্রাশ-ফিল্ড গ্র্যাঞ্জের সঙ্কীর্ণ সীমানায় খাঁচায় বদ্ধ পাখীর মতো সে ছটফট করতে লাগলো। মান-মর্যাদা, অর্থ-সম্পদ সব তখন তুচ্ছ হয়ে গেল। একমাত্র সত্য তখন হীথক্লিফ।

ক্যাথারিন-হীথক্লিফের মিলনের যে দৃশ্যটি তার জাগতিক স্থূল ব্যাখ্যা করা চলেনা। এ মিলন অনিবার্য, অবধারিত; দু'টি অভিন্ন হৃদয় আত্মার সমতার নিদর্শন। এ মিলনের পর ক্যাথারিনের বেঁচে থাকবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। মৃত্যু-তোরণ পেরিয়ে এ মিলনকে সে অক্ষয় করে রাখতে চায়। কিন্তু ক্যাথারিন হীথক্লিফকে পরিত্যাগ করে জীবনের পরম সত্যকে অস্বীকার করেছিল। তাই স্বর্গ ও নরক দু'য়েরই অভিশাপ তার উপরে। হীথক্লিফের মরণোত্তর মিলন তার সঙ্গে যতদিন না ঘটছে, ততদিন ক্যাথারিনের বিদেহী-আত্মা তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াবে। উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে ক্যাথারিনের এই অশরীরী উপস্থিতি। হীথক্লিফের জীবনে পড়েছে তার অদৃশ্য প্রভাব। জীবিত ক্যাথারিন নয়, তার আত্মা এই উপন্যাসটিকে ঘিরে রেখেছে।

হীথক্লিফ-চরিত্র

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হীথক্লিফ রূপকথার শয়তান ও সাহিত্যের খলনায়কের মিশ্রণ। ক্যাথি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি খুব অসুখী, তাই না? শয়তানের মতোই তুমি নিঃসঙ্গ, ঈর্ষাকাতর। কেউ তোমাকে ভালোবাসে না, তুমি মরলে, কেউ কাঁদবে না।"

অজ্ঞাত কুলশীল, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু হীথক্লিফ প্রথম থেকেই সংশ্লিষ্ট সবাইকার জীবনে বয়ে এনেছে অশান্তি ও অশুভ দুর্যোগ। দুর্দান্ত ও উদ্দাম প্রকৃতির হীথক্লিফ-সদৃশ্য চরিত্র খুঁজে পেল ক্যাথারিন আর্নশর মধ্যে। তাদের মধ্যে গড়ে উঠলো আত্মিক বন্ধন। স্বাভাবিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে সেখানে অশান্তি বয়ে আনাই হীথক্লিফের স্বভাব। তাকে বাড়িতে আনার পর থেকেই আর্নশ-পরিবারের সুখ-শান্তিতে

ধরলো ভাঙন। হীথক্লিফকে প্রশ্রয় দেবার জন্য মিঃ আর্নশর সঙ্গে হিণ্ডলের মনোমালিন্য চলতে লাগলো। হীথক্লিফের উপর সে হয়ে উঠলো নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। হিণ্ডলের অন্যায় ব্যবহারে হীথক্লিফ মনে মনে প্রতিশোধের দুর্জয় ইচ্ছা বহন করলেও ক্যাথারিনের ভালোবাসায় সে সব দুঃখ ভুলে থাকতে চাইতো। আর্নশ-পরিবারে সে সর্বনাশ ডেকে আনতো না যদি ক্যাথারিন তার পাশে বরাবর থাকতো। ক্যাথারিনকে সে গভীরভাবে ভালোবাসে। সে তার দ্বিতীয় সত্তা। হীথক্লিফের এই নিবিড় প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করবার মতো মন তখনো ক্যাথারিনের নয়। চপল ও লঘুচিত্ত ক্যাথারিনের চোখে লাগলো মোহের অঞ্জন। অভিজাত বংশের এডগার লিন্টন ও তার সামাজিক মর্যাদা ও ঐশ্বর্যের জন্য সে হীথক্লিফকে অগ্রাহ্য করে এডগারের দিকেই ঝুঁকেছিল। হীথক্লিফের মনোজগতে ক্যাথারিনের এই বিশ্বাসঘাতকতা বয়ে আনলো উত্তাল আলোড়ন। ক্যাথারিন ও হিণ্ডলে দুজনে মিলে হীথক্লিফের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিল। আগে ছিল সে পরিবারের অশুভগ্রহ, এবার হয়ে উঠলো সরাসরি ধ্বংসকারী। হীথক্লিফকে তাই জন্ম থেকেই শয়তান বলা যায় না। শয়তান আখ্যা যদি তাকে দিতেই হয় তবে সে স্বর্গের অধিকারচ্যুত, স্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবদূত। এমিলির চরিত্রের মতো হীথক্লিফেরও প্রবৃত্তি স্বাভাবিক পথে না চলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অন্যদিকে ধাবিত হয়ে ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে। বাধা অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তার আর থামবার উপায় নেই।

হীথক্লিফের প্রতিশোধ নেওয়ার প্রথম পর্যায় হলো হিণ্ডলেকে অধঃপতনের চরমে নিয়ে গিয়ে তবে মৃত্যু ঘটানো। হিণ্ডলের ছেলে হেয়ারটনকে মূর্খ নির্বোধ জড়পদার্থে পরিণত করে তাকে ভৃত্যদের সামিল করে রাখা। ক্যাথারিনকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এডগারের উপর তার মর্মান্তিক আক্রোশ। তাকে জব্দ করবার জন্য সে ইসাবেলাকে প্রলুব্ধ করে বিয়ে করে তার উপর নির্মম অত্যাচার চালাতে লাগলো। প্রতিশোধ-স্পৃহার সঙ্গে এবার তার মনে জেগেছে অর্থলোভ। ইসাবেলাকে বিয়ে করে প্রচুর অর্থের মালিক হওয়ার ইচ্ছা তার প্রবল।

ক্যাথারিনের মৃত্যুতে প্রায় পাগলের মতো হয়ে হীথক্লিফের প্রতিশোধের ইচ্ছা দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। তার ধাক্কা গিয়ে পড়লো এবার পরবর্তী বংশধরদের উপর। হেয়ারটন, ক্যাথি, লিণ্টন কেউই বাদ গেল না। ক্যাথিকে সে জোর করে মৃত্যুপথযাত্রী লিণ্টনের সঙ্গে বিয়ে দিল। তার অবহেলা, অবজ্ঞায় লিণ্টনের জীবন শেষ হয়ে গেল। হেয়ারটনের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে উয়েদারিং হাইটসের মালিক হয়ে জাঁকিয়ে বসলো হীথক্লিফ। এডগার মারা যাবার পর থ্রাসক্রস গ্র্যাঞ্জ ও সব বিষয়-আশয় হীথক্লিফের হাতে এল। এইভাবে হীথক্লিফের প্রতিশোধের আগুনে সবাই পুড়ে গিয়ে বাকি রইলো শুধু হেয়ারটন আর ক্যাথি।

ক্যাথারিনের স্মৃতি হীথক্লীফের মনে অম্লান। ক্যাথারিনের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা গভীর ক্ষতের মতো যন্ত্রণাদায়ক তার কাছে। চরম প্রতিশোধের মুহূর্তেও সেই চিন্তা কখনো তার মনে তৃপ্তি আনেনি। তাই একটার পর আরেকটা প্রতিশোধ নিয়েও তার যন্ত্রণার উপশম হলোনা। দীর্ঘদিন পরে ক্যাথারিনকে পাবার ইচ্ছা তার মনে এত প্রবল হয়ে উঠলো যে মরজীবনের যবনিকা ভেদ করে ক্যাথারিনের বিদেহী আত্মা তার চোখে ধরা দিল। যে প্রবল শক্তি তার মনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছিল এই অলৌকিক দর্শন সেই শক্তিকে পরাস্ত করবার জোর তার মনে এনে দিল। যে বাধা এতকাল পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার জীবনে, প্রাণপণ চেষ্টায় এবার সে তাকে সরাতে সক্ষম হলো।

তার প্রকৃতি নিজস্ব খাতে বয়ে চলবার সুযোগ পেল। প্রতিশোধের ইচ্ছা মুহূর্তে তার কাছে অর্থহীন মনে হলো। হীথক্লিফ রাগ ভুললো, হিংসা ভুললো ; পার্থিব কোনো কিছুতে তার আর আগ্রহ রইলো না। মনে তার এবার শুধু প্রিয়মিলনের আকাঙ্ক্ষা। শেষ বাধাকেও সে সরিয়ে ফেললো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। বিদেহী ক্যাথারিনের সঙ্গে মৃত্যু যবনিকা পার হয়ে এইবার তার ঘটলো পরিপূর্ণ মিলন। জীবনের জীবন ক্যাথারিনের সঙ্গে এক হয়ে সব অশুভ ও গ্লানি ধুয়ে মুছে হীথক্লিফের চরিত্র ট্র্যাজিক মহিমার এক অভিনব মর্যাদা লাভ করলো।